মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩১॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
প্রকাশকাল: আগস্ট ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v60i1-2

DOI: 10.62328/sp.v60i1-2.9
প্রবন্ধ জমাদান: ৬ মে ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ মে ২০২৫
পৃষ্ঠা: ১৪৫-১৭৬

হুমায়ুন কবিরের কবিতা: বিষয়বৈভব ও প্রকরণশৈলী

কবির আহমেদ
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: kahmed14322@gmail.com

সারসংক্ষেপ

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যে কয়েকজন অমিত সম্ভাবনাময় প্রতিবাদী কবির দর্পিত আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্য উচ্চকিত হয়েছিল, হুমায়ুন কবির (১৯৪৮-১৯৭২) তাঁদের অন্যতম। কবি হুমায়ুন কবিরের জীবদ্দশায় একমাত্র প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *কুসুমিত ইস্পাত*। *হুমায়ুন কবির রচনাবলী* ১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে হুমায়ুন কবিরের দুটি কাব্যগ্রন্থ *কুসুমিত ইস্পাত* ও *রক্তের ঋণ* এবং অগ্রন্থিত কবিতা স্থান পায়। হুমায়ুন কবিরের কবিতার বিষয়বৈভব-উপস্থাপন, শৈলীবিন্যাস-শব্দচয়ন এক মন্ময় অনুভূতির রং ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। হুমায়ুন কবিরের কবিতার কাব্যভাষা, নিজস্ব বয়নরীতি ও উপস্থাপনশৈলী এবং স্বরের বিন্যাস তাঁর নিজস্ব কাব্যভাবনার সঙ্গে সমীকৃত হয়ে এক শৈল্পিক রূপরসের পরিজ্ঞান নির্মাণ করে। তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে বহু বর্ণময় ধনাত্মক জীবন-বীক্ষার পরিচায়ক। তাঁর কবিতায় তৎকালীন সময়ের দেশীয় বহুমাত্রিক সংকটের মধ্য দিয়ে কবির চোখে দেখা নানা মাত্রিক চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। ষাটের দশকের কবিতায় কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি, জীবন-অভীপ্সা, নান্দনিকতার নানা অনুষঙ্গ বাংলাদেশের কবিতাকে ঋদ্ধ করে তুলেছিল; *কুসুমিত ইস্পাত* কাব্যটি এর স্মারক। হুমায়ুন কবিরের কবিতার বিষয়বৈভব ও প্রকরণশৈলী বিচার-বিশ্লেষণ করা এ প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

মূলশব্দ

কুসুমিত ইস্পাত, রক্তের ঋণ, ষাটের দশক, মুক্তিযুদ্ধ, স্বদেশপ্রেম, বিচ্ছিন্নতাবোধ, কাব্যভাষা, কবিমানস।

বাংলাদেশের কবিতায় হুমায়ুন কবির এবং বিশ শতকের ষাটের দশকে আবির্ভূত অন্যান্য কবির কবিতা আক্ষরিক অর্থে নতুন প্রণোদনা ও মাত্রা সংযোজন করেছে। কবিদের মনস্বিতা, কাব্যভাষা ও ভাবনাবলয় কবিতাকে দিয়েছে নাগরিক রুচি ও বৈদগ্ধ্য। এ সময়ে আধুনিক কবিতার পালাবদলের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে দু-একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা এবং নিজেদের চিন্তা চেতনাকে কাব্য-আন্দোলনের নতুন উদ্বোধন বলে ঘোষণা করেছিলেন। কলকাতার 'হাংরি জেনারেশন' এবং ঢাকায় 'স্যাড জেনারেশন' কবিতার ক্ষেত্রে একটি অভিঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এবং সেটা পঞ্চাশের কবিদের গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে একটি ভিন্নতর অবস্থান তৈরি করতে পেরেছিল। ষাটের তরুণ কবিরা ঘোষণা করেছিলেন মৃত্যু, যৌনতা, নিয়তি, ধ্বংস, ব্যাধি, হৃদয়, ভালোবাসা, অর্থ—সবকিছুই তাদের কাছে তুচ্ছ। আমেরিকার বিট জেনারেশনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ষাটের দুই গোষ্ঠী দুই বঙ্গে এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে গতানুগতিক মূল্যবোধকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিতে চেয়েছিলেন। এঁরা ছিলেন প্রবলভাবে এস্টাবলিশমেন্ট-বিরোধী। ভাঙন আর ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টির উৎসব করাই ছিল এঁদের প্রতিজ্ঞা। এক দল কবি নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা স্তরের টালমাটাল রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজেদের সৃষ্টিশীলতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে। বাংলাদেশের কবিতা তখন হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতার প্রবল স্পৃহার সমান্তরাল এক প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার। তখনকার কবিতা জনপ্রিয়তায় বাংলাদেশের সকল দশককে অতিক্রম করে এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৭০-এর দেশব্যাপী গণজাগরণ ও উত্তাল গণআন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা, মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে হটিয়ে বিজয় ও স্বাধীনতা-লাভ প্রভৃতির প্রতিটি স্তরে ষাটের শেষের কবিরা এক অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। বায়তুল্লাহ্ কাদেরী (২০০৯: ১৯) মনে করেন: 'কবিরা তাঁদের অস্তিত্বের শেকড় খুঁজতে গিয়ে স্বাধিকারবোধে আন্দোলিত হন, তাঁদের কবিতার উজ্জীবনী শক্তি আসে সঙ্ঘচেতনা এবং নতুন মূল্যবোধের ভাষা-চেতন থেকে। বলাই বাহুল্য কবিদের মানস গঠনের এ প্রক্রিয়াটি একরৈখিক নয়, বরং দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়, পরস্পর বিরোধী বৈপরীত্যপূর্ণ এক জটিল বিন্যাস প্রক্রিয়া।'

হুমায়ুন কবির ষাটের দ্বিতীয় পর্বের কবি হিসেবে আবির্ভূত হন। বাঙালি সত্তার উজ্জীবন এ সময়ে দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। দেশজ-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন। স্বদেশ ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এ পর্বের কবিদের মধ্যে সূচিত হতে থাকে তীব্র প্রতিরোধ-প্রতিক্রিয়া, সাংগ্রামিক মনোভাব এবং উজ্জীবন-স্পৃহা। অর্থাৎ এঁদের কবিতার প্রধান বিষয় ছিল দেশ। হুমায়ুন কবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ঢাকার বহুমাত্রিক সাহিত্য আন্দোলন বিশেষত 'স্বাক্ষর' ও 'কণ্ঠস্বর' গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হন। ঢাকার বিভিন্ন দৈনিকের রবিবাসরীয় সাহিত্যের পাতায় তিনি কবিতা লিখতেন, সম্পাদনা করতেন *কবিতাগুচ্ছ* নামক কবিতা-পত্রিকা। এ সময় তিনি সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি প্রগতিশীল ছাত্ররাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। ফলে তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিফলন সুস্পষ্ট। ষাটের দশকের নব্য কবিদের অধিকাংশের মনন ছিল অবক্ষয়ের বৃত্তে আবর্তিত। ষাটের কবিতার প্রধান অনুষঙ্গ যেমন বোহেমীয়পনা, যৌনতা, আত্মবিধ্বংসীমূলক জীবনদর্শন এবং সর্বপ্রকার অবক্ষয়ের বিরোধী ছিলেন তিনি। কবিতা সৃজনের পাশাপাশি অন্যান্য

সৃষ্টিশীল রচনা, যেমন প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখে এই মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। 'মেরুদণ্ড ও কবিতা' শীর্ষক নিবন্ধটি তরুণ কবিমহলে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রেমিক কবি হুমায়ুন কবির সমকালীন কাব্যচর্চায় আবেগের তারল্য মেনে নিতে পারেননি। এ সবই ছিল তাঁর ধনাত্মক জীবন-বীক্ষার পরিচায়ক।

হুমায়ুন কবির মাটি ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কবিতার আপন ভুবন তৈরি করেছেন, তুলে এনেছেন প্রাতিস্বিক অভিব্যক্তি। এ ছাড়াও তাঁর কবিতায় ভর করে আছে স্থিত জীবনদর্শন। রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন হুমায়ুন কবিরের কবিমন প্রেমচেতনাকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখেনি। সমাজ আর মানবতার বিপর্যয়ের মাঝেও হুমায়ুন কবির আলো দেখতে পেয়েছেন। কবির অভিপ্রায়, উচ্চাশা, বিশ্বাস উপমা-উৎপ্রেক্ষা-কারুকৃতিময়তায় অনন্য। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২—এই তিনটি বছর কবির জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় তাঁর জীবনের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল মুহূর্ত। আবার এই সময়ে সংঘটিত হয়েছিল বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি এ সময়ের ঘটনা। একজন সমাজসচেতন ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কবি এ সময়কার টালমাটাল ঘটনাস্রোতের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে প্রেমিক-কবি ক্রমে ক্রমে প্রতিবাদী কবিতে রূপান্তরিত হতে শুরু করেন। মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন:

> কুসুমের পাশাপাশি বারুদ, বন্দুক ও ইস্পাতের নল তাঁর কবিতায় অনায়াসে স্থান করে নিতে শুরু করলো। গণঅভ্যুত্থানের প্রচণ্ডতা, স্বাধীনতাযুদ্ধে বাঙালীর বীর্যবত্তা, স্বজন হারানোর বেদনা, আবার তারই পাশাপাশি স্বাধীন বাংলাদেশে একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাঁর রচনায় উচ্চকিত হয়ে উঠলো। 'কুসুমিত ইস্পাত'-এর কবিতাগুলোর অধিকাংশ এ সময়ে লিখিত। (১৯৮৫: ০৮)

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব-মুহূর্তে বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পাশাপাশি বাংলার প্রগতিশীল লেখক-সমাজও কলম ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন। এই সংগ্রামী লেখক সমাজের তরুণ সদস্যদের উদ্যোগে গঠিত হয় 'লেখক সংগ্রাম শিবির'। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর তরুণ লেখক গোষ্ঠীর উদ্যোগে 'বাংলাদেশ লেখক শিবির' গঠিত হয়। হুমায়ুন কবির এবং মুহম্মদ নূরুল হুদা 'বাংলাদেশ লেখক শিবিরে'র আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ লেখক শিবিরের অন্যতম আহ্বায়ক থাকাকালে ১৯৭২ সালের ৬ই জুন অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে হুমায়ুন কবির নিহত হন। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭২—এই আট বছর কবির লেখক-জীবন। মৃত্যুর মাসখানেকের মধ্যে ঢাকার বাংলাবাজারস্থ খান ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোম্পানী থেকে ৭৪টি কবিতা সংবলিত *কুসুমিত ইস্পাতে*র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বিষয় ও আঙ্গিকে এ গ্রন্থটি সমকালীন কাব্যগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট যা কবির সৃষ্টিসত্তার দ্রুততম বিকাশকে প্রকাশ করে। সমাজসম্পৃক্ত অনুভবে ও বস্তুনিষ্ঠ জীবনচেতনায় তাঁর কবিতাগুলো জাতিসত্তার গভীর মূলস্পর্শী। জাতীয় আবেগকে শিল্পিত শব্দরূপ দানেই কেবল নয়, সাম্যবাদী জীবনচেতনার অঙ্গীকারে কবির সাফল্য ও স্বাতন্ত্র্য বিস্ময়কর। তাঁর কবিতা পাঠ করলে সমাজ, জীবন, রাজনীতিমনস্ক জীবনদৃষ্টির গভীরতা নির্ধারণ সম্ভব। *রক্তের ঋণ* নামক আরেকটি কাব্যগ্রন্থ *হুমায়ুন কবির রচনাবলী*তে সংকলিত হয়েছে। কাব্যটিতে গণজাগরণমূলক কবিতার প্রাধান্য রয়েছে। *রক্তের ঋণে*র বাইরে পাওয়া অন্যান্য কবিতা 'অগ্রন্থিত কবিতা' শিরোনামে ওই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কবিতার অবয়ব নির্মাণে, বিশেষত উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও

শব্দচয়নে কবি অনেকটাই জীবনানন্দীয়। ছন্দের ওপর সহজাত দখল, প্রেম ও নিসর্গপ্রীতি তাঁর কবিতার প্রধান অবলম্বন।

হুমায়ুন কবিরের কবিতায় মধ্যবিত্তের সংকট, আত্মপরিচয়গত সংকট, শাহরিক জীবনানুষঙ্গ ও নাগরিক অবক্ষয়, জীবনাচরণে বোহেমীয়বোধজাত অন্তর্দহন ও মনশ্চাপ, তীব্র স্বদেশ-চেতনা ভাষারূপ পেয়েছে নান্দনিক শব্দপ্রতিমায়। আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন:

> তাঁর প্রথমদিকের কবিতায় ছিল নিসর্গের সাথে পরম আত্মলীনতা। পরে, জীবনবোধে একটা বড় রকমের রূপান্তর ঘটেছিল। কিন্তু কবিতার ভাষায় ছিল আশ্চর্য সংযম। শিল্পের শালীনতা। (২০০৯)

সুন্দর ও শাশ্বতবোধে কবি লক্ষ করেছেন চরম অসামঞ্জস্য। বিরুদ্ধ ও বিপরীত সময়ের কবি বলেই সময়ের পঙ্কিলতায় তিনি *কুসুমিত ইস্পাত*কে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর 'ডিসেম্বরের নিসর্গ' কবি-অস্তিত্বের সংহারক বলেই হয়তো তাঁর অন্তর্দহনের সঙ্গে পেয়েছে একাত্মতা। কবিতার ভাষায়:

> নিসর্গ জ্বলছে এই ঝোপের বাগানে
> চুপিসারে ডাকে যেন অলজ্জ রমণী
> পুষ্পের দহন শিখা জ্বলে প্রতি ছোবলে ছোবলে
> জ্বলে যায় অস্থিমজ্জা, জ্বলে লোকালয়।
> নিসর্গ জ্বলছে যেন হরিৎ বাঘিনী
> ঝোপ রাখে খোলা তার মুখ
> যেন খাবে প্রকৃতি বিলাসী কবিটিকে।
> (হুমায়ুন ১৯৮৫: ৩১)

বাংলাদেশের কবিতার পটভূমিতে হুমায়ুন কবিরের আবির্ভাব ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে। এ দশকের কবিদের প্রায় সকলেই দার্শনিক অভিজ্ঞানে স্ব স্ব কাব্যজগতে আলোক প্রক্ষেপণ করেছেন। পাশ্চাত্য জীবনদর্শন ও নানা মাত্রিক সাহিত্য-চিত্রকলাসহ কাব্যান্দোলনে প্রভাবিত হয়েছেন তাঁরা। আত্মবিবরকামী, পলায়নপর, নেতিবাচক জীবন-জিজ্ঞাসার যন্ত্রণাবিদ্ধ এবং রক্তক্ষরণে বিমর্ষ সমকালীন চৈতন্য তাঁকে আলোড়িত করলেও কবিজীবনের সূচনাকাল থেকেই তিনি ইতিবাচক জীবন-মীমাংসা সন্ধানের প্রশ্নে ঐকান্তিক। অবশ্য সমকালীন জীবনের উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা, রক্তপাত ও আত্মহনন যে তাঁকে আলোড়িত করেনি, তা নয়। পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য, নাগরিক যন্ত্রণা ও ক্লেদ আক্রান্ত সমাজব্যবস্থায় একধরনের নেতিকে প্রত্যক্ষ করে জীবন-সংবেদের অতি স্পর্শকাতরতায় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানুষ নিপতিত হয় চরম অস্তিত্ব সংকটে। ব্যক্তি-অস্তিত্ব গ্রাস করে নেয় শাহরিক পুঁজিবাদী যান্ত্রিক সভ্যতা ও ক্লেদ বিষাদময় জীবন। অস্তিত্বের বিপন্নতা ষাটের কবিরা অনুভব করেছেন সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রেক্ষাপটে। কিন্তু হুমায়ুন কবির জ্ঞানপরিধির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্য ও সমকালের মধ্যে একটি শিল্পিত সমন্বয় সাধনে সক্ষম হয়েছেন। ষাটের দশকের নবোদ্ভূত কবিগোষ্ঠীর পাশ্চাত্যমুখী শিল্পভাবনার সঙ্গে কবির ব্যক্তিস্বরূপ ও সমাজস্বরূপ আবিষ্কারের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে *কুসুমিত ইস্পাতে*। উন্মোচনের এই নতুন মাত্রাই প্রথম কাব্য থেকেই তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে। 'নিঃসঙ্গ' কবিতায় কবি বলেন:

একলা বড় সন্ধ্যাবেলায় কৃপণ চাঁদের আলো
কোন দিকে যে সাঁতার দেবো রাত্রি হলে পাখীর চোখে গভীর
বৃক্ষ শাখা বুক নামিয়ে নিলে
কোথায় বরাভয়
কোনদিকে ফুল পারুল বকুল, কোথায় বাতাস বয়।
রাত্রি হলে জলের ঘরে জ্বলে না মাছ রূপোর মত দেহে
কফিন কালো অন্ধকারে নড়ে না কোন স্বর
ভূতের বাসর সবচে' বড় ফুলে
অন্ধকারে কোথায় যাব
কোন তারাকে করব স্বয়ম্বর।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৫)

ষাটের দশকে প্রবলভাবে আলোচিত loss of relationship, loss of identity ইত্যাদি পাশ্চাত্য বিষয় ওই সময়ের অন্য কবিদের মতো হুমায়ুন কবিরকেও প্রভাবিত করেছে। ব্যক্তির অস্তিত্ব যখন সঙ্কটাপন্ন, সময় যখন প্রতিকূল এবং অভিযোজনহীন অবস্থা সমাজে লক্ষযোগ্য, তখন ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হতে থাকে তাঁর পরিপার্শ্ব থেকে। ব্যক্তির আত্মনিমজ্জন তখন তাঁর প্রধান অবলোকন হয়ে ওঠে। রফিকউল্লাহ খান বলেন:

> সমাজ ও বস্তুজীবন বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা একজন কবির মধ্যে তখনই জাগ্রত হয়, যখন কবির কাছে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় অবলম্বনের নতুন ক্ষেত্র। ষাটের দশকের একজন কবির কাছে সমাজসত্তা অপেক্ষা ব্যক্তিসত্তার মূল্য বেশি হওয়ার কারণ জীবনের বাস্তব প্রচ্ছদ থেকে সাময়িকভাবে হলেও তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। (২০০২: ১৫৪)

হুমায়ুন কবিরের কবিচেতনায় বিচ্ছিন্নতার কার্যকরণ বিশ্লেষণ করতে গেলে কতকগুলো বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা অত্যাবশ্যক। সেক্ষেত্রে প্রথমেই আসে কবির ব্যক্তিজীবন, তারপর আসে তাঁর সমকালীন জীবনের প্রসঙ্গ এবং আসে তাঁর কালের সাহিত্যের নানা প্রবণতা এবং সেগুলোর সঙ্গে কবির সম্পৃক্ততার প্রসঙ্গ। হুমায়ুনের সমকাল ছিল নানা ঘটনা ও প্রবণতায় বিক্ষুব্ধ। পুঁজিবাদ সমস্ত মানবিক মূল্যবোধের বিনাশ সাধন করে সবকিছুকে পণ্যজ্ঞান করেছিল তাঁর সাহিত্য রচনার কালে। তৎকালীন বাংলার আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দুর্ভিক্ষ, পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণ-বঞ্চনা তাঁর কবিচেতনায় তৈরি করেছিল বিচ্ছিন্নতার বলয়। বায়তুল্লাহ্ কাদেরী বলেন:

> ষাটের দশকের কবিতায় বিচ্ছিন্নচেতনা কাজ করেছে কবিদের অস্তিত্বসংকটজনিত প্রতিক্রিয়ায়; কখনো অভিযোজন অক্ষম মানসিকতায়, সমাজ-জীবন ও ব্যক্তিসত্তায় বৈরী মনোভাবাপন্ন চেতনার থেকে। কখনো কখনো ব্যক্তিপ্রেম ও তজ্জনিত হতাশাবোধও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আবার কখনো অপরাধবোধ ও অনুশোচনাও কবিদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে। শাহরিক জীবনের অনিবার্য কঠিন বাস্তবতায় বিশেষ করে গ্রামীণ নস্টালজিক চেতনা থেকে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ কাজ করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবিদের সর্বগ্রাসী লিবিডোচেতনা। (২০০৯: ৯০)

'রাতের গন্ধ' কবিতায় বিচ্ছিন্নতাবোধ এসেছে এভাবে:

এক আঁধারে গোলাপ বনে কেউ ছিল না

কেবল সাপ স্মৃতির সাথে ফুলের সাথে
রতি পরিমলের মতো লুকিয়ে ছিল
কেউ ছিল না বন্ধ বাগান কেবল অভিশাপ।
কেউ ছিল না মস্ত আঁধার মর্ত্যলোকে
কেউ ছিল না ঝাউয়ের নীচে ঘাসের স্বেদে কেবল পাপ।
(হুমায়ুন ১৯৮৫:২৭)

প্রকৃতিকে যেভাবে উপস্থাপন করলে জরা-ক্লান্তি-যুগজ্বর-অবসাদ-রিক্ততা কিংবা হতাশা-স্থবিরতা-একাকিত্ব বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, সেভাবেই হুমায়ুন কবির নিসর্গ চিত্রাঙ্কনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। তাঁর কবিতায় প্রকৃতির এক ধূসর, ক্ষয়িষ্ণু, ম্লান কালো অন্ধকারের প্রকাশ বড় হয়ে উঠেছে। 'পদাবলীর মতো' কবিতায় কবি বলেন:

আমি আর নদীতে যাব না।
তোমার বুকের বাঁকে বড় ভয়; কালিন্দীর জল
যেন ছল্ ছল্ করে ওঠে; ভয় হয় বড় ভয় হয়
চাঁদ জেগে ওঠে, তমালের বনে এলোমেলো ঝড়
বড় ভয় জাগে একা এই কালো অন্ধকারে।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ২৯)

নিঃসঙ্গতাপীড়িত কবি প্রকৃতির নেতিবাচক চিত্র অঙ্কন করেছেন। নিসর্গের সতেজ, সুন্দর, প্রাণোচ্ছল ছবি তিনি আঁকেননি। কখনো প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপমূর্তি আঁকলেও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত। নিসর্গের বিবর্ণ-বিকৃত রূপ 'ডিসেম্বরে নিসর্গ' কবিতায় এভাবে ধরা পড়ে:

নিসর্গ জ্বলছে যেন হরিৎ বাঘিনী
ঝোপ রাখে খোলা তার মুখ
যেন খাবে প্রকৃতি বিলাসী কবিটিকে
মেয়েদের মতো লাল বাদামের পাতা
মাঠের রোয়াকে শুয়ে
মোহিনী জঠর মেলে ডাকে সর্বনাশ।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৩১)

'আরশী নগর' কবিতায় কবির সহজ স্বীকারোক্তি:

মানুষের দ্বিপ্রহর কাটে ঘামে ও রক্তের সাথে
রিরংসা ও ক্রোধে, আমি তো মুকুরে বন্দী
লড়াই নিজের সাথে, ভালবাসা খেলা।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৫২)

কবির এই বিচ্ছিন্নতাবোধ কবিকে নিয়ে যায় অবক্ষয়ী চেতনায়। হতাশা, নৈরাশ্য ও আত্মনির্যাতনের উপমারূপেই কবি অবক্ষয়িত জীবন ও মননের মধ্যে নিবিষ্ট হন। নাগরিক ক্লেদ, বিবমিষা ও বৈকল্যে সৃষ্ট কবিআত্মা রুগ্‌ণ ময়লা সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করে। এভাবে কাব্যভাষায় ও ভাবে কবি অবক্ষয়ী চেতনার এক জটিলগ্রন্থি রচনা করেন। তাঁর শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও হতাশা, ক্লান্তি, অবসাদ, ব্যর্থতা এবং সংশয়ের যন্ত্রণা লক্ষগোচর হয়। ধনতান্ত্রিক

শোষণ-নিষ্পেষণ, যান্ত্রিক জীবনের অভিঘাত সুস্থ-সুন্দর কল্যাণকামিতার ধারণাকে পরিত্যক্ত করে। উনিশ শতকের শেষ দিকের শিল্পসাহিত্যে ফ্রান্সে এই অবক্ষয়বাদের সূচনা। বোদলেয়ার হলেন অবক্ষয়বাদের আদিগুরু। তাঁর সঙ্গে তৎকালীন বিট জেনারেশনের কবিরাও উনিশ শতকীয় অবক্ষয় চেতনার দ্বারা উজ্জীবিত হয়েছিলেন। সৃষ্টি-সম্ভাবনাহীন ব্যক্তির নিমজ্জন ও অবক্ষয় তাঁদের কবিতায় স্থান পেয়েছে। 'এস তুমি, বাতাস বাহিনী' কবিতায় কবি বলেন:

বিনষ্ট আমার ঘুমে-স্তব বাজে, বাতাসবাহিনী
তোমার আনত আঁখি অঘ্রাণের পীতাভ বাতাসে
শরীরে বুলায় হাত, জ্বেলে রাখি বিমর্ষ প্রদীপ
আমাদের চারিদিকে অন্ধকার ঘিরে আসে,
ভীষণ আঁধার সবদিকে
বাতাসবাহিনী, ফুল্ল দুয়ার খোল, খোল আজ
বড় বেশি আফিমের ফুল ফুটে আছে।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৯৬)

অবক্ষয়ী চেতনায় উজ্জীবিত কবিসত্তা পাপের নিমজ্জনেই মুক্তিপ্রয়াসী। 'একটি পাখীর বেনামে' কবিতায় কবি প্রকাশ করলেন পুঁজিবাদী বিশ্বের অবক্ষয়ী রূপ:

সারাদিন মানুষেরা টাকাকড়ি নাড়াচাড়া করে
রূপের কুটিল বিষ আঙ্গুলের সব পরপারে
রক্তে বাসা বাঁধে বৃদ্ধ কম্পোজিটার যেমন
লেড পয়জনিংয়ে মরে দ্যাখো, এই শতকে মানুষ
টাকার রূপোলী বিষে তেমন মরছে।
এখানে ঘুঘুকে কারা কুসুমের প্রলোভন দিয়ে
নিয়ে এল? বাদামী পালকে ঝরে
ধোঁয়া পিচ কার্নিশের জল।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ১০৯)

ষাটের দশকের কবিরা ঈশ্বরের প্রসঙ্গ কবিতায় এনেছেন পাশ্চাত্য কাব্যকলা পঠনের সূত্র ধরে। অবশ্য তিরিশের দশকের কল্লোলীয় কবিরাও এঁদের সমানভাবে প্রভাবিত করেছেন। হুমায়ুন কবিরও এর ব্যতিক্রম নন। 'রূপকথা' শীর্ষক কবিতায় কবি জীবনানন্দীয় ভঙ্গিতেই কালের অবক্ষয় ও যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করেন। কবিতাটিতে ঈশ্বরচেতনা এভাবে এসেছে:

শহর নিষ্পত্র দেখে সুখের পাখীরা যেই
পালাবার কোলাহল করে। তখন
একটি গাছ আনত মস্তকে থাকে বেদনায় ম্লান
যেন তার অপরাধ হয়ে গেল।
ঈশ্বর শাখার দিকে তর্জনী বাড়িয়ে
বলে যান—গাছ, তুমি যথাযথ
প্রার্থনাকে ভুলে গেছ। স্নিগ্ধ
রেস্পিরেশনে বর্ষা বাজাবে তুমি কথা ছিল
অথচ নিশ্চুপ—তখন একটি গাছ দুঃখী
হয়ে থাকে।

(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৩৮)

ষাটের দশকের কবিরা তীব্র প্রতিষ্ঠানবিরোধী, প্রবলভাবে নৈসঃঙ্গ্যপীড়িত। বিচ্ছিন্নতাবোধ ও হার্দিক-রক্তক্ষরণের অনবদ্য রূপকার হিসেবে কবি-আত্মার গোপন সত্তা হিসেবে মৃত্যুকে সাব্যস্ত করেছেন তাঁরা। মৃত্যুকে কবিতার উপজীব্য করেই এই কবিকুল অন্তর্লোকের অতল থেকে বেরিয়ে এসেছেন বহির্লোকের প্রাঙ্গণে। মারী ও মড়ক, রিক্ততা আর রুগ্‌ণতা সেই সময়ের প্রধান স্মারক। প্রবলভাবে নেতিবাদী ষাটের কবিরা মৃত্যুকে কবিতায় হাজির করেছেন সীমাহীন স্বাধীনতায়, এক অদৃশ্য সৃষ্টির বেদনাজালে আবিষ্ট রেখে। হুমায়ুন কবিরের কবিতায় মৃত্যুচেতনা তাঁর বিচিত্র অনুভূতির স্মারক হয়ে উঠেছে। 'শোভনাকে ভুলে থাকার কবিতা' কবিতায় স্মৃতিকাতর কবি বলেন:

ঘুম ভাঙতে বুক জুড়ে শুয়ে থাকে শোভনার মুখ
স্মৃতিকে শাসন করি, বলি: তোর মরে যাওয়া ভাল
যেমন মরছে চৈত্র, শোভনাও দূরে গিয়ে যেমন মরেছে
তবুও রক্তের সাথে হেঁটে আসে চোখের কাজল
টিপের সিঁদূর লাল আরো সব রক্তমাখা স্মৃতি!
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৫)

'ডিসেম্বরে নিসর্গ' কবিতায় নিসর্গ, নারী, ঈশ্বর ও মৃত্যু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়—

কবিও খসায় তার শিরস্ত্রাণ সর্ববিধ কাপড় চোপড়
প্রকৃতি কামুকী নারী ডাক দিলে কাছে যেতে হয়;
জীবন বিনাশী মায়া তবুও কবিকে নেয় তার দর্পস্থলে
মরণের মাঝখানে কবি চেনে ঈশ্বরীও প্রকৃতির নাম।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৩১)

পৃথিবীর সমস্ত ক্লান্তি কবিকে নিরাশ্রয় করে। কবি হন স্মৃতিকাতর, বেদনাবিধুর। আত্মীয় স্বজনহীন কবি 'কোন কোন জ্যোৎস্নায় মৃত মুখ' কবিতায় বলেন:

কোনো কোনো জ্যোৎস্নায় মৃতদের মুখ মনে পড়ে
মৃতের চোখের মত জল ছল্ ছল্ করে ওঠে
অন্ধকারে যেমন প্রেমিক তার বিরূপ নারীকে
ডাকে ব্যথিত রক্তের থেকে উঠে।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৬০)

ষাটের দশকের কবিদের জন্ম মূলত এক বিরুদ্ধ অস্থিতিশীল, অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়-সঙ্কটে। ব্যক্তির উচ্ছ্বাসহীন আত্মনিমজ্জন এ সময়ের কবিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত কবিচৈতন্যকে মারাত্মক আত্মবিভ্রমে নিপতিত করেছিল। দেশজ কাব্য-সংস্কৃতির রোমান্টিক ভাবকল্পনা ও জীবনাদর্শ কবিদের জীবনবোধের জন্য সহায়ক ছিল না। আইয়ুব খানের শাসন ও শোষণের প্রভাব, বিভাগোত্তর স্বপ্নভঙ্গের অনিবার্য পরিণাম, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ষাটের কবিদের জীবন-অভিপ্রায় থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। পাশ্চাত্য শিল্প, সাহিত্য, রুচি ও জীবনাচরণে তাঁরা অত্যধিক পক্ষপাত প্রদর্শন করেন।

ষাটের দশকের কবিদের মানসগঠন-কাল তৎকালীন রাষ্ট্র কাঠামোর বিবিধ দ্বন্দ্বময় বিবর্তনের মধ্যে নিহিত ছিল। বিশেষ করে দ্বিজাতিতত্ত্বের নিরিখে পাকিস্তানের অভ্যুদয়ে একধরনের আত্মতৃপ্তিতে নিমজ্জিত হলেও সেই স্বপ্নের মোহ ভাঙতে বাঙালির বিলম্ব হয়নি। ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমেই তার কিছু কিছু লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। এই আন্দোলনে সুপ্ত ছিল গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, ইহলৌকিক ও স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা। ফলত এই আন্দোলনের সফলতার মাধ্যমে ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক দর্শনের অর্থহীনতা প্রকাশিত হয়ে নতুন রাষ্ট্রের সম্ভাবনা জাগ্রত হয়। কবি হুমায়ুন কবির একুশে ফেব্রুয়ারিকে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকাশের অনুষঙ্গ করেছিলেন। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে এসে অপরাপর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম তীব্র রূপ লাভ করায়, পাকিস্তান রাষ্ট্রের বন্ধন বেশ কিছুটা শিথিল হওয়ায়, এবং পূর্ববাংলার জনমনে জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়ায় ভাষা-আন্দোলনভিত্তিক কবিতার মেজাজে একটি মৌলিক পরিবর্তন আসে। হুমায়ুন কবির 'ফেব্রুয়ারী' শীর্ষক কবিতায় ফেব্রুয়ারিকে দেখেন বাঙালির দুর্বার সংগ্রাম আর বিপ্লবের উৎস হিসেবে:

> কেন তুমি চলে যাও? তৃণ রন্ধ্রে যে বিক্ষোভ বাজে
> সোনালী পাতার দাবী প্রকৃতির তুরন্ত নিঃশ্বাস
> নানান আগুনে পুষ্পের মধুকাল
> অকল্পিত, শুনি রুদ্রের ঝংকার
> রক্তে এবং দেহের ও দু'ধারে তাই।
> যেহেতু হাজার জনের সঙ্গে আছি
> তীব্র আগুন বাজায় দীপ্র রাগ।
> বাজায় শুনছি অগ্নির ভায়োলীন
> (হুমায়ুন ১৯৮৫: ৪১)

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান পূর্ববাংলার মানুষকে নাড়া দেয় প্রচণ্ডভাবে। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকগুলো মৌলিক প্রশ্ন তীব্রভাবে উচ্চারিত হয় এবং সমাধানের রাস্তাও আলোকোজ্জ্বল বলে প্রতিভাত হয়। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে এসে বাংলার গণমানুষের মধ্যে মনোদৈহিক পরিবর্তন আসে। সমালোচক বলেন:

> ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে এসে দুঃস্বপ্ন থেকে স্বপ্নের দিকে বাঙালির অভিযাত্রা শুরু হয়। এই রূপান্তরের সাক্ষ্য ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম। এই আন্দোলন-সংগ্রামের প্রকৃতি ছিল এমন যে, এটি তার পরিধি ক্রমাগত বাড়িয়েছে। (কুদরত ২০২২: ২৬১)

১৯৬৯ সালের ১৭ই জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ওপর নির্যাতন করলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় 'খণ্ডযুদ্ধ' সংঘটিত হয়। ছাত্ররা বাসে অগ্নিসংযোগ করলে বিকেলে পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনী ৩৪ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ২০শে জানুয়ারি আবার ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান শহিদ হন। এ ঘটনা ঢাকা শহরে ছাত্রদের মধ্যে ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ২২শে জানুয়ারিতে লেখা ডায়ারিতে ছাত্র-আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতা প্রসঙ্গে আবদুল হক লেখেন:

> ২০ তারিখে পুলিশের গুলী বর্ষণে ক'জন ছাত্রের মৃত্যু এরূপ আবেগের বন্যার সৃষ্টি করেছিল যে, বিশ্বদ্যিালয়ের অধ্যাপকেরা নিজেদের একটি শোক মিছিল বার করতে বাধ্য হন,

> মোহসিন হলের প্রভোস্ট ড. ইন্নাস আলী ছাত্রদের শোক সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছাত্রদের ওপর নির্যাতনের নিন্দা করে বিবৃতি দেন। (১৯৯৬: ১৩৩)

১৯৬৬ সালের ছয় দফার পথরেখা ধরে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের তীব্রতা কবিচৈতন্যকে প্রভাবিত করে। 'জানুয়ারী ১৯৬৯' কবিতায় কবি লেখেন:

> নিজের ভাইয়ের দেহ কুকুরের পোশাকী আহার
> হতে দেখি; রক্তে ভাসে আমাদের সোনালী কান্তার
> বাংলায় শস্যক্ষেত্রে বহুবার বর্গীর ঝাঁক
> এবং চিতার পালে রুধিরাক্ত খয়েরী হরিণ।
> বাইরে অযুত কণ্ঠ। রক্তলাল জ্বলে জানুয়ারী
> (হুমায়ুন ১৯৮৫:৮২)

জাতীয়তাবাদী চেতনা যখন দানা বাঁধতে থাকে তখন এর পক্ষের মানুষেরা তৈরি করতে থাকে বিভিন্ন আদর্শ। এই আদর্শ তখন জনগোষ্ঠীর চৈতন্যে কাজ করে অনুপ্রেরণা হিসেবে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিহত কোনো শক্তিকে কেন্দ্রে স্থাপন করে তাকে প্রতিরোধের হাতিয়ার করে তোলে এবং অন্য অনেককে একত্র হতে উদ্বুদ্ধ করে। কবিরা আত্মত্যাগ নিয়ে রচনা করেন কবিতা। কবিতায় নির্মিত হয় জাতীয়তাবাদী চেতনা। পূর্ববাংলায় এই ধারার জাতীয়তাবাদী জাগরণধর্মী কবিতার শুরু প্রকৃতপক্ষে ১৯৫২ সাল থেকে। এটি নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয় ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে। শহিদ আসাদ, মতিউরকে নিয়ে তাৎক্ষণিক কবিতা লেখা হয় প্রচুর। শামসুর রাহমানের 'আসাদের শার্ট', আল মাহমুদের 'উনসত্তরের ছড়া-১' ইত্যাদি এর স্বাক্ষর বহন করে। হুমায়ুন কবিরের 'আসাদের মৃত্যুতে আমি চিরদিন' কবিতায় আসাদের মিছিল হয়ে উঠেছে বাঙালির চিরন্তন সংগ্রাম আর সাহসের প্রতীক:

> তবুও, আসাদ, তোমার ঝেড়ো হাসি
> আমাদের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে বেজে যায়
> তবুও, আসাদ, তোমার শক্ত হাতটা
> আমার কাঁধে এসে পড়ে গৃহস্থের পায়রা যেমন
> 'চলুন, হুমায়ুন কবির
> মিছিলে যাবেন?'
> আমি মিছিলে যাব আসাদ
> চিরদিন তোমার মিছিলে।
> (হুমায়ুন ১৯৮৫: ১১২)

'নিহত বন্ধুর প্রতি কবিতায়' কবি আসাদের আত্মত্যাগের ইতিহাসকে স্মরণ করে কবি বলেন:

> নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে তুমি যে নিশান তুলে দিয়ে গেলে
> সে নিশান প্রতিহিংসা আমাদের মুঠিতে এখন
> আমরা সবাই আছি, তুমি নেই, তাই তো লড়াই
> এ লড়ায়ে জয়ী হব, তোমার রক্তের শোধ চাই।
> (হুমায়ুন ১৯৮৫: ১২৪)

বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলন, এবং তার পরবর্তী বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ষাটের কবিদের মধ্যে সৃষ্টি করে স্বদেশপ্রেম। তাঁদের কবিতায় প্রাক্-মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বদেশ ও সমাজভাবনার চেয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বদেশচেতনা অধিকতর মৃত্তিকাসংলগ্ন, সমাজমনস্ক; মাটি ও মানুষের প্রশ্নে দায়বদ্ধ। ষাটের দশকের উপান্তে অর্থাৎ ১৯৭০-এর পরে বাঙালির মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার বাসনায় আন্দোলিত হতে থাকে পূর্ববাংলা। নির্বাচনে জয়লাভের পর ও ক্ষমতা হস্তান্তরের বিচিত্র টালবাহানা বাঙালিকে ক্রমাগত সন্দিহান আর উত্তেজিত করে তোলে। ১৯৭১ সালের শুরু থেকেই পূর্ববাংলায় চলতে থাকে ক্রমাগত হরতাল অবরোধ আর বিপরীতে চলতে থাকে পাকিস্তানি সেনা-পুলিশের দমন নির্যাতন। দিন যত গড়িয়েছে, পূর্ববাংলা তত ফুঁসে উঠেছে; পূর্ববাংলার মানুষের কাছে স্বাধীনতার বিষয়টি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। হুমায়ুন কবির ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পরিপূর্ণ পরিণত যুবক; দেশপ্রেমের চেতনায় ভাস্বর। ফলে সমসময়ের অন্য সাহিত্যিকদের মতো স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে কবিও প্রচেষ্টা চালিয়েছেন কলমের কালি আর অস্ত্র হাতে। আর এভাবেই তাঁর কাব্যে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের ইতিহাস এবং যুদ্ধকালে বাংলার মানুষের দিনলিপি। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একক কাব্যগ্রন্থ তিনি লেখেননি। তবে তাঁর রচিত ও প্রকাশিত কবিতায়—খণ্ড কবিতায় বা কবিতার খণ্ডাংশে—মুক্তিযুদ্ধকে তিনি অনুষঙ্গ করেছেন। 'আমার ভাই', 'ঘুম', 'এ কেমন শহর', 'দুঃখ দিনের গাথা', 'আমরা পুলিশ', 'যাদের রক্তাক্ত দেহ', 'রক্তের প্রতিরোধ প্রস্তর শক্ত', 'মার্চে প্রথম কারফ্যু', 'এপ্রিলে রচিত কবিতা ১৯৭১', 'মুক্তিযুদ্ধে কবি', 'লাল বলের মত গ্রেনেড', 'কুড়ি আনার বিলে', 'বধ্যভূমির নিসর্গ', 'স্বাধীনতা', 'ডিসেম্বরে বঙ্গদেশ', 'বিজয়ের পর', 'জানুয়ারীতে দুঃখের কবিতা', 'শহীদের কবিতা', 'বাংলার-কারবালা' প্রভৃতি কবিতায় উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ। এসব কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ, বৃহত্তর গণচেতনা, তীব্র স্বাদেশিক ভাবনা। তারুণ্যের শিরা-উপশিরার টগবগে রক্ত উছলে উঠেছে এসব কবিতায়। তাঁর যুদ্ধবর্ণনা যেমন বিশ্বাস্য ও আন্তরিক, দেশপ্রেমের চেতনাও তেমন উজ্জ্বল। বস্তুত মুক্তিযুদ্ধের বিশ্বস্ত চিত্রায়নে এই কবিতাগুলো সমৃদ্ধ। 'লাল বলের মতো গ্রেনেড' কবিতায় বলেন:

শৈশবের লাল বল, অবহেলে ছুঁড়ে দিচ্ছে গ্রেনেড
স্বয়ংক্রিয় বন্দুক বাজছে মাউথ অর্গানের উজ্জ্বল সুরের মতো
শস্যের সবুজ যবনিকার মাঝখানে, দাদী আম্মার
শান্ত পল্লীতে, সোনালী মিনার ঘেরা
শহরের আলোময় স্ট্রিটে
হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে, শত্রুদের প্রতি অমায়িক
দাওয়াত তুলে দাও, ছোঁড় লাল বলের মতো গ্রেনেড
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৫৪)

'মার্চে প্রথম কারফ্যু' কবিতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আগ্রাসনকে তিনি তুলে ধরেন এভাবে:

মানুষের বিপরীত রীতির মতন
মার্চের সেই শান্ত রাতে 'দ্যুতিময় জন্তুর উত্থান'
আধো আলো এ্যাভিন্যু ট্রাফিকে দ্বীপ
ডাস্টবিন, নানারূপ গলি

নীরবে উগরে দিল খাকী দেহ, লাল চোখ
ইস্পাতের হিংস্র দাঁত মিলিটারী কয়েক হাজার।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৫১)

একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর বাঙালি নিধনের তাণ্ডবলীলা কবি তুলে ধরেছেন সেই নরকবাসের মধ্যে বাস করে; কবির উচ্চারণ তাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উত্তাপে ঋদ্ধ। আল মাহমুদ ১৯৭১ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমিতে 'আমাদের কবিতা' বিষয়ক তাঁর পঠিত প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছিলেন, তৃতীয় বিশ্বের একটি মুক্তিকামী অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশের নিসর্গের ফাঁকে ফাঁকে বন্দুকের নলকে খুব শিগগিরই প্রত্যক্ষ করা যাবে। এরপরই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। অকালপ্রয়াত কবি হুমায়ুন কবির তাঁর কবিতায় লেখেন:

স্টেনগানের প্রতিটি ঝলকে বাজাল উজ্জ্বল সুর
শৈশবের বল ছুঁড়লো গ্রেনেডে, অকম্পিত সঙ্গীত
বিঁধলো শত্রুর দেহ। আমার নিজের ভাই
বড় বেশি ভালো সে বাসতো স্বাধীনতা
জননীর নিষেধ মানেনি, পিতার অবাধ্য হয়েছিল
পতাকার রক্তিম সাহস তাকে ডাক দিল
স্বদেশের ছবি রক্তে, ঝাঁপ দিল স্বদেশের নামে।
আামার কিশোর ভাই, প্রিয় ছিল স্বাধীনতা
স্লোগানে উত্তাল হত খুব। দর্পিত বাতাস
তাকে ডাক দিল, স্টেনগান বাজাল সঙ্গীত
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৬৭)

উপর্যুক্ত কবিতায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মুক্তিযোদ্ধাকে একে অপরের ভাই হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কবি কারবালার ভয়াবহ ধ্বংসলীলার সাথে তুলনা করেন। 'বাংলার কারবালা' শীর্ষক কবিতায় কবি বলেন:

কারবালা হয়ে যায় সমস্ত বাংলাদেশ হায়
কারবালা হয়ে যায়।
পত্রহীন সব গাছ, তৃণহীন প্রান্তর, হা হা করে
জল নেই জল নেই কান্নাকাটা শিশুদের গ্রীবা
চতুর্দিকে ঝালসায় কৃতান্ত সীমার
ভীষণ খঞ্জর তার বিদ্ধ করে এই বাংলার
আমাকে অন্যকে, আর জননীকে, হায়!
ভীষণ যন্ত্রণা দেয়, দুঃখ দেয় শুধু।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ১৮৭)

'রক্তের প্রতিরোধ প্রস্তর শক্ত' কবিতায় কবি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আগ্রাসন রুখে দিতে চান রক্তের প্রতিরোধে। এই প্রতিরোধ ইস্পাতসম। কবিতার চরণ:

জনপদে জনপদে লাল রক্তের চিহ্ন
বুক দিয়ে রুখছি যে রুখছি যে বর্বর পদাঘাতে

নগরীর চারিদিকে ব্যারিকেডে টলমল
জ্বলছে উজ্জ্বল ব্যারিকেড, মানুষের রক্তিম ব্যারিকেড
আমার নিজের দেহ, আমার ভাইয়ের দেহ
রাজপথে রক্ত রক্ত
বর্বর বোঝেনি ও রক্তের প্রতিরোধ
হতে পারে প্রচুর শক্ত।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৫০)

মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কবি 'ভিন্ন ফুল' কবিতায়। এ কবিতায় কবি শহিদদের লাল ফুলের সাথে তুলনা করেন:

ফুল খুব স্থির বসে তার টবে
কম্পাসের মতো স্থির গোল লাল ফুল
কবরভূমির শান্ত দেয়ালের পাশে
তারা ভুল বিষণ্নতা ভুলে
ভালবাসা ভালবাসা খেলা করে।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ১১)

বাংলাদেশের কবিতায় পূর্ববাংলার উপস্থিতি বিচিত্র ও প্রাণবন্ত। এর নিসর্গ, প্রবহমান লোকজ ঐতিহ্য ও জনজীবনের দুর্গতি কবিদের চিত্তে প্রবাহিত ও অন্তর্লীন হয়ে তাঁদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ষড়ঋতুর বিবিধ বিন্যাস নিয়ে কবিতা রচনা শুরু হয় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা পর্ব থেকে। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা', জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' স্লোগানে পরিণত হয়েছে। পূর্ববাংলাকে নিয়ে কবিতা রচনা বাংলা সাহিত্যে নতুন কোনো ঘটনা নয়, যদিও পাকিস্তান আমলের কবিতায় ভিন্ন তাৎপর্য অনুসন্ধান করা যেতে পারে। কবি সানাউল হকের 'তিতাস', সৈয়দ আলী আহসানের 'আমার পূর্ববাংলা', আ ন ম বজলুর রশীদের 'আমার দেশ: সপ্তরাগ' ইত্যাদি কবিতা বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। এ সমস্ত কবিতায় পূর্ববাংলার প্রাণপ্রবাহকে আবিষ্কার ও নিজের সমগ্র অস্তিত্বে তার প্রবাহ নির্ণয়ের চেষ্টা রয়েছে। হুমায়ুন কবির 'রক্তের প্রতিবেশী জন্মভূমি', 'পূর্ব বাঙলার দুঃখ', 'রূপসী বাংলা', 'আমার সাধের বঙ্গে', 'সহজেই পূর্ববঙ্গ', 'বাংলার কারবালা' ইত্যাদি কবিতায় মাতৃভূমির প্রতি নিজের প্রগাঢ় ভালোবাসা ও নিজের জীবনে তার প্রভাবের কথা ব্যক্ত করেছেন। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সবুজে শ্যামলে গরীয়ান এ দেশ কবির চৈতন্যকে যেভাবে হরণ করেছে এবং ঋতুতে ঋতুতে প্রভাব বিস্তার করে মনের প্রতিটি স্তর নির্মাণ করেছে তার বিবরণ রয়েছে। 'রক্তের প্রতিবেশী জন্মভূমি' কবিতায় কবি বাংলাকে রক্তের প্রতিবেশী ও নিসর্গ সুন্দরী বলে অভিহিত করেন:

রূপালী মাছের মতো চৈতন্যে করছ খেলা তুমি
রক্তের প্রতিবেশী চিরদিন তুমি, জন্মভূমি।
(হুমায়ুন ১৯৮৫:৬৩)

স্বদেশকে উপলব্ধি করার এই আন্তরিক প্রয়াস দু ধারায় প্রবাহিত। একটি ধারায় অবলম্বিত হয় সমকালীন জীবনের দুর্দশাগ্রস্ত রূপ। বহুমাত্রিক হতাশা ও অবক্ষয় কবির মনে স্বদেশ

সম্পর্কে যে সামগ্রিক চিত্র তৈরি করেছিল, তা-ই বেদনাবোধে জারিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে কবিতায়। 'পূর্ব বাঙলার দুঃখ' কবিতায় কবির উচ্চারণ:

বর্গী আসে বঙ্গদেশে একবার যেমন এসেছে
অতীতে: ভেঙে দ্যায় আমাদের সাজানো বাগান
দেবদেউল পদাঘাতে ভেঙে পড়ে হয়ে খানখান
চণ্ডীদাস ও রামী কাঁদে, দুঃখে কাঁদে রবীন্দ্র ঠাকুর।
(হুমায়ুন ১৯৮৫:১১৭)

'রূপসী বাংলা' কবিতায় কবি আনেন জীবনানন্দ দাশের অনুষঙ্গ, বাংলাকে বলেন দর্পিতা মরালী, অভিহিত করেন সকল কবির প্রেয়সী হিসেবে। প্রাসঙ্গিক অংশ:

... জীবনানন্দের মৃন্ময়ী
কবিদের সকল প্রেমিকা, তোমার
সান্নিধ্যে থেকে আমাদের সবুজ বাহুরা
বেড়ে ওঠে মধ্যাহ্নের বটবৃন্দ
প্রতিটি প্রশাখা, দ্যাখো, ভরে আছে পুষ্পিত বন্দুকে
আকাশের নীল অহংকার, দর্পিতা মরালী
লোকান্তরে ব্যাপ্ত আছ, কবিদের সকল প্রেয়সী।
(হুমায়ুন ১৯৮৫:১২০)

কখনো পূর্ববঙ্গ হয়ে ওঠে ঐক্যের প্রতীক। কবি দীপ্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন:

কল্লোল জেগে ওঠে জনতা জলধির
জলোচ্ছ্বাস, শোকোচ্ছ্বাস। সুদৃঢ় মানুষ
তবু মেরুদণ্ড খুঁটি করে ওড়ায় পতাকা
রহস্যের যুক্তরাজ্য ভেঙে ফেলে সোনালী সাহসে।
একহাতে শোক চিহ্ন অন্য হাতে তুলে ধরি জয়ের নিশান
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ১৭৬)

ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ববাংলায় জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রেরণা হয়ে ওঠেন। একদিকে রবীন্দ্র-বিষয়ে পাকিস্তানি শাসকচক্র ও পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনার অনুসারীদের নেতিবাচক মনোভাব, অন্যদিকে পূর্ববাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও সংস্কৃতিকর্মীদের রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণার উৎস মনে করে আঁকড়ে ধরা—এ দুয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সমকালীন কবিরা প্রেরণা বোধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কবিতা লেখার। নিজের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অবস্থিতি খোঁজেন কবিরা। শামসুর রাহমান বলেন, 'আমার মননে/ রাবীন্দ্রিক ধ্যান জাগে নতুন বিন্যাসে/ এবং মেলাই তাকে বাস্তবের তুমুল রোদ্দুরে' (২০১২: ২৭২)। সৈয়দ শামসুল হক লেখেন: 'এ যেন তুমি আমাদেরই দ্বিতীয়/ শরীর কোনো এক রবীন্দ্রনাথের/ গান সমস্ত কিছুর কেন্দ্রেই আছো' (সৈয়দ শামসুল ২০১২: ১৭২)। সিকান্দার আবু জাফর 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক কবিতায় বলেন: 'আমাকে বেষ্টন করে আছো,/ অবিশ্বাস্য অদৃষ্টের মতো;/ আমাকে আচ্ছন্ন করে আছো/ প্রতি মুহূর্তের বর্জনের প্রয়াসে বিকৃত/ অনিবার্য অভ্যাসের মতো' (সিকান্দার ২০১৭: ১৩৭)। শহীদ কাদরী লেখেন 'রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামের কবিতা। ষাটের প্রথমার্ধের কবিতায় কবিরা রবীন্দ্রনাথকে মূলত

তাঁদের ঐতিহ্য প্রেরণা ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য হিসেবে রূপায়ণ করেছেন। হুমায়ুন কবির তাঁর 'রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত', 'রবীন্দ্রনাথ', 'বৃষ্টিতে রবীন্দ্র সঙ্গীত' ইত্যাদি কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে বোধ ও মননের প্রতীক রূপে চিত্রিত করেন। কবি যখনই অবরুদ্ধ বোধ করেছেন, তখনই আশ্রয় খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন তাঁর বদ্ধ ঘরের একটি মুক্ত জানালা, কীর্তিত হয়েছেন চেতনার রুপালি মশাল হিসেবে। 'রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত' কবিতায় কবির উচ্চারণ:

প্রত্যহ মৃত্যুকে দেখি। 'বক্ষো মাঝে বেঁধেছিল বাসা'
যূথিকার দীর্ঘশ্বাসে গ্রামছুট রাঙা ধুলো পথে
যে সবুজ তরবারি পেয়েছিলে গানে গানে ভেসেছে নিখিল
তেমনি একটি ফুল, চেতনার রূপালী মশাল
আমাদের ছুঁতে দিও, বৃদ্ধ বাউল দীপ্র রবীন্দ্র ঠাকুর,
যাদের পায়ের শব্দ মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে
তাদের আসার আগে পৃথিবীতে বেঁচে থেকে যাই
যতক্ষণ বেঁচে থাকে নীল ঝিঁ ঝিঁ সবুজ শালিক।
(হুমায়ুন ১৯৮৫:১১)

'রবীন্দ্রনাথ' শীষর্ক কবিতায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের অমর চরিত্রে শচীশ, দামিনী, দুখিরাম, চন্দরা, অভীক প্রভৃতির প্রসঙ্গ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে কবি চেয়েছেন বাঙালির জাগরূক শক্তির আধার হিসেবে। কবি যেমন সেই সময়ের অবরুদ্ধ বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন এই কবিতায়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পুনর্জাগরণ ঘটানোর আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন:

... শোনাতে এমন গান
যোদ্ধার তরুণ দেহ পিন খোলা গ্রেনেডের মতো
বিপজ্জনক হয়ে ছুটে যায় শত্রুর ঘাঁটিতে
অথবা শেখাতে তুমি পলায়নপর কবিদের
কি করে নির্ভুল গুলী ছোঁড়া যায় এল.এম.জি.
মাটিতে না রেখে।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৮০)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভের পর হুমায়ুন কবিরের কর্মজীবন শুরু হয়েছিল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ১৯৭০ সালে তিনি কক্সবাজার কলেজের বাংলার অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৭০ সালের ৬ই জুলাই পান বাংলা একাডেমি গবেষণা বৃত্তি। বাংলা একাডেমিতে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল জীবনানন্দ দাশ ও তাঁর কবিতা। আজীবন জীবনানন্দ-অনুরাগী হুমায়ুন কবির জীবনানন্দ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৯৭২ সালের ১২ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদানের আগ পর্যন্ত গবেষণায় সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত ছিলেন তিনি। হুমায়ুন কবিরের মনোজগৎ গঠনে জীবনানন্দের কবিতা ভাবগত, রূপগত ও চেতনাগত প্রণোদনা জুগিয়েছে। জীবনানন্দ নিসর্গ থেকেই যেন সংগ্রহ করেছিলেন বৈদগ্ধ্য, সাহিত্যপ্রীতি, মানসিক আভিজাত্য। 'জীবনানন্দ দাশ' কবিতায় হুমায়ুন কবির বলেন:

নিসর্গ তোমাকে, কবি, দিয়েছিল কেমন লবণ

যাদের কনক স্বাদে ভীষণ শহর মাধবী নিধন
ক্রুদ্ধ কথকতা নিয়ে হয়ে যেত হলুদ সংসার
না হলে কেমন করে তুমি ছিলে
জরামৃত্যুমারী ভরা—আমাদের নীরব নিখিলে।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ১২)

হুমায়ুন কবির কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করে লিখেছেন 'পাখীরে সে ডেকেছিল'। কবিতাটিতে নজরুলকে 'প্রিয়তম আলোর পুরুষ' অভিধায় অভিষিক্ত করেছেন তিনি:

উটের কাফেলা ক্লান্ত ফিরে গেছে নূহের নাবিক
তবু তো প্রবাল দ্বীপে ডেকেছিল ঝড়ের সওয়ার
বিষম বিষাণ হাতে প্রিয়তম আলোর পুরুষ
আগ্নেয় আশ্বাস মেখে সুবিশাল সফেদ ডানায়
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ১৭২)

যূথবদ্ধ মানুষের উদ্দীপনা ও তাদের মিলিত শক্তির বেগবান সত্যকে উপলব্ধি করেছেন বলেই কবি তাঁর কবিতায় এমন দীপ্ত উচ্চারণ করতে পারেন। হুমায়ুন কবিরের কবিতায় খণ্ডিত নিসর্গ নয়, এসেছে পরিপূর্ণ নিসর্গ। স্বতঃস্ফূর্ত ও বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো এসেছে নিসর্গ। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি এক স্বয়ম্ভু অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে মনোজৈবিক সম্পর্কের সূত্র নির্ণীত হয় তাঁর কবিতায়। প্রকৃতিচেতনা, জীবন ও মৃত্যুর স্বরূপ উপলব্ধি, দেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতা, মানুষ ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের সন্ধান এবং সর্বোপরি প্রচণ্ড আবেগী আশাবাদ তাঁর কবিতাকে এক অসাধারণ মহিমায় ভাস্বর করে তুলেছে। তীব্র সমাজ ও স্বদেশ-চেতনার বশবর্তী হয়ে রক্তাক্ত প্রত্যয়ে নিজের মধ্যেই তিনি হয়েছেন ক্ষতবিক্ষত। তাঁর কবিসত্তা অস্থির, দহনতুল্য অভিযোজনহীন অস্তিত্ব সঙ্কটে নিপতিত হয়েও শান্তি-প্রত্যাশী। ষাটের দশকের আর্তি, ক্ষতার্ত জীবনের চিত্র তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে ব্যতিক্রমী শব্দচয়নে। স্বাধীনতা, দেশজ জনপদ, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা হুমায়ুন কবির 'আপন জন্মভূমির মুখ' কবিতায় ফুটিয়ে তোলেন। একধরনের প্রশান্ত, আত্মপ্রতীতি-নির্ভর, আনন্দ শিহরনময় প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা কবির:

সর্বনাশের ভিতর দিয়ে তোমার জন্ম
নিসর্গের হরিৎ সংসারে লাফিয়ে উঠছ তুমি
উজ্জ্বল বঙ্কিম তরকারী। ...
রুপালী মাছের মতো চৈতন্যে করছ খেলা তুমি
রক্তের প্রতিবেশী চিরদিন তুমি, জন্মভূমি।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৬৩)

আধুনিক বাংলা কবিতাকে মহত্তম শিল্প-সৌন্দর্যে সুষমামণ্ডিত করে তোলার ক্ষেত্রে প্রকৃতির ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হুমায়ুন কবির রহস্যময়তা ও কাব্যিক প্রেরণাকে সাঙ্গীকৃত করে প্রকৃতির অন্তরাত্মার শোভন-সুন্দর রূপ পরিস্ফুট করেছেন তাঁর কাব্যে। নিসর্গ সংশ্লিষ্ট শব্দরাজিকে অধিকাংশ কবিতার নামকরণে প্রযুক্ত করে গ্রন্থটিকে তিনি শৈল্পিক মানদণ্ডে উন্নীত করেছেন। তাঁর কবিতা যেন বৃক্ষ-ফুল-পশু-পাখির এক সাম্রাজ্য। হুমায়ুন কবিরের 'বাগান', 'বৃষ্টিতে একটি পাখী', 'বৃক্ষ', 'শুধু বৃষ্টি পড়ে', 'ল্যান্ডস্কেপ', 'বৃক্ষাভিযান', 'একটি

পোকার স্নেহে', 'ডালের ছায়া', 'শারদ চিন্তা', 'পাখীকে', 'শ্রাবণ আমাকে', 'পুষ্পিত জ্যোৎস্না', 'রূপকথা', 'বধ্যভূমির নিসর্গ', 'কোনো কোনো জ্যোৎস্নায় মৃতদের মুখ', 'ব্যগ্র তূণীর', 'ডিসেম্বরে বঙ্গদেশ', 'খড়ের শব্দ', 'শীতল জল', 'জলপ্রপাত' 'এস তুমি, বাতাসবাহিনী', 'নদীর গল্প', 'একটি পাখীর বেনামে', 'ফাল্গুন যখন', 'গভীর চাঁদের নিচে', 'রূপসী বাংলা', 'নিসর্গ মাকে', 'রৌদ্রলীন কিশলয়', 'রোদের পাখীরা', 'এই ডালপালায় গাছ', 'বসন্তের লাইলাক', 'চিরহরিৎ বৃক্ষের পত্রালী', 'আলোর পাখিকে' প্রভৃতি কবিতায় নিসর্গ ও প্রকৃতি-চেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'গোলাপ ভূমিতে' শীর্ষক কবিতায় কবি বলেন:

তুমি গোলাপভূমিতে খুব দূরে
পাহাড়ের ওপারে পাহাড়
তার ওপারেও পাহাড়, শস্যভূমি
হরিণের বাগানবাড়ি, অনেক রকম মেঘ
গোলাপভূমিতে আকাশ ছুঁয়েছে ফুল,
গোলাপভূমিতে তোমার অধিষ্ঠান।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ১৫৫)

কুসুমিত ইস্পাত কাব্যের প্রথম কবিতা 'বাগান'; এই কবিতায় তাঁর নিসর্গচেতনার স্বরূপ উপলব্ধি করে পাঠক:

বাগানে যাই বাগানে বড় সুখ
সেখানে পাতা বুকের মতন বড়
সেখানে হাওয়া হিমের ছোঁয়া নেই
সবুজ লাল গোলাপ চতুর্মুখ
বাগানে যাই বাগানে নেই পাপ
ঘাসের চোখে শিশুর অভিলাষ
আকাশ আলো বুকের তলে লীন
ঝাউয়ের ডালে নরম কোমল সাপ
বাগানে যাই বাগানে বড় সুখ।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৩)

কবিতার ভাষা কখনো দ্রোহের, কখনো প্রেমের, আবার কখনো অনাচারের বিরুদ্ধে চিরায়ত প্রথাকে দুমড়ে মুচড়ে দেয়। কবিতার তাই নিজস্ব ঘরানার একটা আলাদা ভাষা আছে। হুমায়ুন কবিরের কবিতায় দেশ-কাল, রাজনীতি, সমাজ, সামাজিক বৈষম্য, মানবিক মূল্যবোধ, প্রেম ও দ্রোহ স্থান পেয়েছে পরম্পরায়। কবিতা যে শুধু শিল্পের জন্য শিল্প নয়, সমাজ বিনির্মাণের হাতিয়ার, সে স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতা উদ্ভাসিত হয়েছে শক্তিশালী কাব্যভাবনা ও স্বকীয় কাব্য-চেতনার নিরন্তর প্রয়াসে। তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা 'পার্শ্ববর্তিনী সহপাঠিনীকে'। নাটকীয় স্বগতোক্তির ঢঙে রচিত এ কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয় প্রেম। অবশ্য হুমায়ুনের কবিতায় শেষাবধি প্রেম ও প্রকৃতির প্রাধান্য খুব একটা ক্ষুণ্ন হয়নি। এই কবিতায় রয়েছে 'বৈষ্ণব পদাবলী' এবং 'নতুন কবিতা'র প্রসঙ্গ। প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে প্রেমিকের সংলাপ:

কি তার এমন ক্ষতি যদি আমি চোখে চোখ রাখি

পদাবলী প'ড়ে থাক সাতাশে জুলাই বহুদুর
এ্যাখোন দুপুর দ্যাখো দোতালায় পড়ে আছে একা ...
সেদিন সকালে আমি, গায়ে ছিল ভাঁজ ভাঙ্গা জামা
দাঁড়িয়েছিলাম পথে হাতে ছিল নতুন কবিতা
হেঁটে গেলে দ্রুত পায়ে তাকালে না তুমি
কাজ ছিল নাকি খুব? বুঝি তাই হবে
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৭)

কবির প্রেমচেতনার স্বরূপ ফুটে উঠেছে 'শোভনাকে ভুলে থাকার কবিতা', 'প্রেম ছাড়া বড় ম্লান', 'হাসপাতাল থেকে ফেরা', 'শব্দমন্ত্র', 'তোমাকে বেসেছি ভালো', 'রাজার দুলাল নই', 'উত্তরণ', 'প্রেমের কবিতা', 'প্রেম' ইত্যাদি কবিতায়। জীবনানন্দের যেমন রয়েছে বনলতা সেন, অরুণিমা স্যানাল, তেমনি হুমায়ুন কবিরের রয়েছে শোভনা, মীরা। 'শোভনাকে ভুলে থাকার কবিতা'য় শোভনা বারবার ফিরে আসে হৃদয়পটে। একজোড়া চাঁদ, ডোয়ার্ফ জারুল, রবীন্দ্রসংগীত শোভনার স্মৃতিকে উসকে দেয়। স্মৃতিবিধুর কবির তাই আহ্বান:

আমাকে বিশ্রাম দাও। চলে যাওয়া, মৃতা, অপ্সরী
শোভনা, বেদনা বড়, ঘুম ভেঙে মুখখানা
বালিশে বাগানে বুকে খেলা করে
সুনিদ্রা চেয়েছি শুধু, শোভনা, শোভনা ...
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৪)

শোভনাকে স্পর্শের স্মৃতি গোপন মোমের মতো জেগে থাকে কবির চিত্তে। প্রেম ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্য ম্লান, রিক্ত, শূন্য। রোমান্টিক প্রেমের ঐকান্তিকতায় কবির সহজ স্বীকারোক্তি:

আমাকে দহন কর, পুষ্পের বিনম্র শিখা জ্বালো
দ্যাখো নামে মেঘছায়া, তৃণময় মাঠ সন্ধ্যার বিমর্ষ কান্তি
লোকালয়ে ও কোলাহল নেই, একটি একাকী পাখি
উড়ে গেল মদির মৃদঙ্গে
নামাও আনত মুখ, বিধুমুখী, এ বক্ষপরে
প্রেম ছাড়া বড় ম্লান পৃথিবীর এই দৃশ্যাবলী।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ১৩)

শোভনার জন্য কবি বনে যেতে চান রাজার দুলাল হয়ে:

রাজার দুলাল নই, তবুও শোভনা
তোমার ঠোঁটের নীল বিভা
কুসুম সংকীর্ণ গ্রীবা; চোখভরা অপ্সরার আলো
যখন বেদনা আনে হতে চাই রাজার দুলাল
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৩৪)

'উত্তরণ' কবিতায় প্রেমময় মনোভাষার সরল আর্তি চোখে পড়ে। কবিতার ভুবনডাঙায় জীবনের অনুপ্রাসে বাসা বাঁধে প্রেম। এ এক অসাধারণ অনুভূতি আর আত্মবিশ্বাসের শক্তি তাঁর কবিতায়। পৃথিবীর সমস্ত বিরূপতা-নেতিবাচকতা একদিকে, আর প্রেয়সী শোভনা অন্যদিকে। শোভনা হয়ে ওঠে স্বস্তির আর ভালোবাসার প্রতীক:

তবুও তোমাকে যখন ভাবছি, শোভনা
পৃথিবী মানুষ এবং গোলাপ ফুলেও
বিরূপতা যদি নিশ্চয় থাকে তবুও
তোমাকে ভাবলে ভালো লাগে সবই, শোভনা।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৮৪)

জীবনের উত্থান ও পতনে কবি শোভনাকেই কামনা করেন:

জীবন ও নয় শুধুই জ্যোৎস্না রৌদ্র
তুমি কি রয়েছ শুধু মানষের জন্য
পৃথিবীর হাটে নানা রকম পণ্য
তুমি ও বুঝি তাহার একটি, শোভনা।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৬৮)

'কালরাত' কবিতায় রয়েছে মীরার প্রসঙ্গ। কবিতায় প্রেমচেতনার বিষয়ে মাসুদুল হক বলেন:

> যেকোনো কবিরই নন্দনতত্ত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর প্রেমের কবিতায়। কেননা প্রেমচেতনার মধ্য দিয়ে কবি তার ব্যক্তিমানস-গঠনকে সামষ্টিক মানস গঠনের মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে চান, যার ফলে কবি তাঁর চেতনার উপলব্ধিকে নান্দনিক বিস্তারে সঞ্চারিত করতে চান পাঠকের কাছে। কাজেই কবির বাহ্যবিশ্ব ও অভ্যন্তরীণ বিশ্ব একটি ঐক্যের সূত্রে সূচনা করে তার প্রেমচেতনার। (২০০৮: ১৪২)

হুমায়ুন কবিরের কবিতায় নগরমনস্কতা বিদ্যমান। ফলে নাগরিক মনের ক্লেদ, গ্লানি, সৌন্দর্য প্রবলভাবেই তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। অন্যান্য সমকালীন কবির মতোই নাগরিক জীবনের নানাবিধ অনুষঙ্গ ও অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত করার প্রয়াস তাঁর কবিতায় লক্ষণীয়। 'ঘুম', 'এ কেমন শহর', 'যন্ত্র যন্ত্র', 'নগর', 'পানশালায় সন্ধ্যা', 'কার জন্যে বসে থাক' ইত্যাদি কবিতায় রয়েছে নাগরিক অনুষঙ্গ। 'ঘুম' কবিতায় কবি বীভৎস শহরের চিত্র এঁকেছেন। সঙ্ঘবিচ্ছিন্ন-চেতনায় কবি ধ্বংসোন্মুখ শহরকে প্রত্যক্ষ করেন এভাবে:

শহর বিধ্বস্ত আজ; জনপদ ভেঙে পড়ে ঘুমে,
বিরল বসতি পথে চলাচল থেমে যায়; ইতস্তত হাত নাড়ে ভয়
নিহত জ্যোৎস্নারা থাক কটিতটে স্নিগ্ধ মধুকরী
শহর বিধ্বস্ত আজ, বেঁচে থাকি, এসো কোনো মতে।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৬৯)

হুমায়ুন কবিরের কবিতায় শহর সমকালীন চেতনায় চিত্রিত হয়েছে। 'এ কেমন শহর' কবিতায় কবি নিষ্ঠুর, নষ্ট, নিরানন্দ শহরের বর্ণনা করেছেন। শহরের অবক্ষয় ও অন্ধকার দিকই তাঁর কবিতায় উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রাসঙ্গিক অংশ:

এ কেমন শহরে তুমি দাঁড়ালে, সখা
সারারাত সান্ত্রীর আনাগোনা পদপাত নেই
দূর কাছের শস্যক্ষেত্রে কিষাণের
পাখী নেই, শিশু নেই; অযুত গোলাম
সোনার শিকল নিয়ে খেলা করে

এ কেমন শহর।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৩৯)

রেডিয়েটর, ইস্পাতের কল, চাকার গর্জন, কংক্রীটের ঝোপ, তপ্ত কলকারখানার ফারনেস, পাথরের টুকরো বেষ্টিত যান্ত্রিক নগরের বর্ণনা কবি দেন এভাবে:

সবুজ গাড়ি চড়াই ভাঙে
খানিক দূরে কল বসেছে ইস্পাতের
মানুষেরা উন্মুখ চেয়ে আছে
তপ্ত ফারনেসের দিকে।
ফারনেস, তুমি কোন ভালবাসা শেখাবে।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৭৩)

নাগরিক মন ও মনন নিঃসঙ্গ, বিবিক্ত ও বিচ্ছিন্ন। বোহেমীয় চেতনায় কবির শহর-পরিক্রমণ বৃত্তাবদ্ধ। সেখানেও আছে দেহজপ্রেম, অস্তিত্বহীনতা, অপরাধপ্রবণতা, গ্লানিবোধ। 'নগর' কবিতার আবহ নির্মিত হয়েছে শাহরিক রাজপথ, রেস্তোরাঁ, রূপসি মহিলা, ডাবল ডেকার বাস, কংক্রিটের ঝোপ, জারে রাখা মাছ এবং প্যাস্টোরাল চাঁদের কারসাজিতে। 'পানশালায় সন্ধ্যা' কবিতায় রূপসিদের আনাগোনা, চটুল সংগীত, পপগান, শরাব, বিজলি বাতি, নিতম্বী মেয়ের নাচ, সিগারেট ইত্যাদি শাহরিক আবহ তৈরি করেছে। ষাটের কবিরা শহর বন্দনার কবি। শহরের কলুষ, অধঃপতিত জীবন ও অবক্ষয়ের মধ্যে পরিবর্তিত পাপ-সন্তান রূপেই তাঁরা প্রকাশিত। তাঁদের শহর চেতনা-স্রোতের একাত্মতায়, অবদমনের খেয়ালি বাঁকে, রূঢ় জীবনযাপনে বৈচিত্র্যময়। শহরের নিরেট কঠিন, সঙ্গীহীন পরিবেশে কবিদের আগমনী সুর অনেকটাই প্রতীকী। 'নগর' এবং 'যেন চলে যাই' কবিতায় 'কবিকে' বলা হয়েছে কলঙ্কিত:

শ্যাওলার কণা ভাঙ্গে জারে রাখা মাছ
ডাবল ডেকারে যায় কলঙ্কিত কবি।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৮৭)

ঊষর ও আনন্দহীন নগরের সবকিছুই তাঁর কাছে অবাস্তব মনে হয়:

তবু কেন অবাস্তব মনে হয় নগরীর মাতাল অর্গান
কেন এত শিশুদের ছবি ছাপে খবরের কাগজে
কেন এত? কেন এত, এত মৃত্যু, এত মৃত্যু—
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ২০৪)

'বৃক্ষ' কবিতায় কবি এমন এক নগরের প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন, যেখানে রয়েছে বিনষ্ট গণিকা, গুপ্তঘাতী ভাড়াটে কসাই, কঠিন কামারশালা; সেখানে এ্যাভিন্যুর অ্যাসফল্ট পাত পাখিদের দগ্ধ করে, মুড়ে দেয় সুনীল আকাশ। কবির বর্ণনায়:

নগরীর বাড়িঘর গুপ্তঘাতী; ভাড়াটে কসাই
কাঠুরে ও হত্যাকারী লাফায় দাপায়
কঠিন কামারশালা পাতা আছে, সবল যুবারা
স্বহাতে বানিয়ে তোলে তাপিত কুঠার
শানায় গোপন ছুরি-পরস্পর ভাই যেন তারা

বানায় শহর যন্ত্র, অ্যাভিন্যুর এ্যাসফল্ট পাতে
দগ্ধ করে পাখীদের, শিশুদের, বিশীর্ণ কার্পেটে
মুড়ে দেয় সুনীল আকাশ।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ১০)

হুমায়ুন কবিরের কবিতায় গ্রামীণচেতনা এসেছে শহরের প্রতিঅনুষঙ্গরূপে। বিধ্বস্ত শহরের বর্ণনায় ও জীবনচেতনায় কবি গ্রামীণ জীবনপ্রবাহে নিজের একাকিত্ব ও অন্তর্দহনের প্রশমন চেয়েছেন। 'কুড়িআনার কিষাণী আমাকে?', 'খড়ের শব্দ', 'যেন চলে যাই', 'কৈশোরিক', 'একদা কৈশোরে', 'নদী' ইত্যাদি কবিতায় কবির নস্টালজিক ভাবনা এবং গ্রামচেতনা কার্যকর হয়েছে। গ্রামীণ সৌন্দর্যবোধ ও সম্পর্ক মূল্যায়িত হয়েছে তাঁর কবিতায় গভীর সমবেদনায়। একধরনের মরমিয়া টান কবি অনুভব করেন গ্রামীণ জনপদের সাথে একাত্ম হবার। ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ মূলত আন্দোলন-সংগ্রামে মুখর সময়। এই আন্দোলন-সংগ্রাম মূলত পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভূমিকার বিরুদ্ধে নিজেদের স্বকীয়তা জানান দেওয়ার বহিঃপ্রকাশ। রাজপথে আন্দোলন-সংগ্রাম যত বেড়েছে, পূর্ববাংলার মানুষের মধ্যে দেশাত্মবোধ তত জাগ্রত মূর্তি ধারণ করেছে। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে পূর্ববাংলার মানুষ তাদের উৎসে ফেরার ব্যাকুলতা দেখিয়েছে, গ্রামকে তাদের চেতনার প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই একই চেতনার উৎস থেকে কবিরা গ্রামের প্রকৃতি ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি দেখিয়েছেন তীব্র টান। 'কুড়ি আনার কৃষাণী' শীর্ষক কবিতায় কবির উচ্চারণ:

কুড়িআনার কিষাণী, তার সন্তানেরা
শুয়ে আছে ধানের ক্ষেতের নীচে।
তারা ধান ভালবেসেছিল, জন্মভূমির
উৎস ভালবেসেছিল—ধান।
পেয়ারা বাগানে বাতাস মর্মর ধ্বনি তোলে
কুড়িআনার কিষাণী, কুড়িআনার কিষাণী
বারবার আমাকে ধানের কথা বলে।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৬৬)

ধান হয়ে ওঠে পূর্ববাংলার প্রাচুর্যের প্রতীক। শান্ত বিলের জলের নিচে ঘুমন্ত মাছের ঝাঁক আর চাতালে খড়ের শব্দপাত মনে করিয়ে দেয় সমৃদ্ধ পূর্ববাংলাকে। 'খড়ের শব্দ' কবিতায় কবি বলেন:

ধানের সুমিষ্ট স্মৃতি। কৃষাণের
শান্ত অবসাদ ঝরছে সারাদিন গ্রামের
পথে ঘাটে এক সাধু
একতারা হাতে গাছগাছালির পাতা
শান্ত বিল জলের অপার নীচে
ঘুমন্ত মাছের ঝাঁক অনেক কাঁদালো
খড়ের সঙ্গীত শুনে তার
ধানের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৬৯)

নদীর তীর, বনপলাশ, হিজল আর কদমতলা, বকুল আর যূথী, বনমালতী, শিরীষ শাখা, ডুবন্ত চাঁদ, পাখির পাখা আর আঁধার আকাশ 'কৈশোরিক' কবিতার শরীর নির্মাণ করেছে। 'যেন চলে যাই' কবিতায় কবি যেতে চান শৈশবে, মায়ের কাছে:

অথচ লাগে না ভালো, শৈশবের কথা মনে পড়ে
মায়ের মুখের কাছে বিকেলের নানান জাফরী
চলে যেতে চাই শুধু। যেন চলে যাই।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৮৩)

'একদা কৈশোরে' কবি মজেছেন বাসমতী ঘাস, কলমির দল, বৈশাখী আকাশ আর বিবাগী বিকেলে। কাজলরেখার গল্প, ছাতিম ছায়া, ধুমেল আলো, বাদামি চিল, শিউলির গন্ধ, দোয়েলের শিস, বাতাবির বাগান, প্রজাপতি পাখা, ঝিলমিল পাখি কবির নিসর্গচেতনার ভাষা তৈরি করে। নাগরিক কবি তাই অতীতকে মনে করে বলেন:

প্রজাপতি পাখা হয়ে উড়ে গেছে সে সব সময়
সখাহীন কি ভীষণ এখন একাকী
হুমায়ুন নাম ধরে কেউ আর ডাকবে না হায়
জানালার কাঁচ ছুঁয়ে উড়বে না ঝিলমিল পাখী।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ১৭৮)

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ—নদীর গর্ভ থেকেই বাংলার জন্ম হয়েছে। এ অঞ্চলের জনচৈতন্যে ও জীবনযাপনে নদীর রয়েছে সুদূরপ্রসারী প্রভাব। আবদুর রাজ্জাক (১৯৮৯: ৯) বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমানে যেমন অতীতেও তেমনি নির্ধারিত হয়েছে এখানকার নদীগুলো এবং নদীবাহিত জল দ্বারা।'

বাংলাদেশের কবিতায় উপমা, রূপক, চিত্রকল্পের একটা ব্যাপক অংশ দখল করে আছে নদী। নদী এখানকার মানুষের যেমন আশ্রয়, তেমনি সংগ্রাম আর জীবিকারও আধার। হুমায়ুন কবিরের 'ভয়', 'একটি পোকার স্নেহে', 'পদাবলীর মতো', 'বধ্যভূমির নিসর্গ', 'রক্তের প্রতিবেশী জন্মভূমি', 'খড়ের শব্দ', 'অন্তরঙ্গের প্রতি', 'নদীর গল্প', 'কৈশোরিক', 'প্রেমের কবিতা', 'প্রেমময় বর্ষণ', 'অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়', 'নদী' প্রভৃতি কবিতায় নদীর প্রসঙ্গ এসেছে বিভিন্ন তাৎপর্যে। ষাটের দশকে যখন পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে, তখন পূর্ববাংলার মানুষের চিন্তা আর এর প্রকাশের অনুষঙ্গ হিসেবে নদী আর নিরীহ থাকেনি। এই নদী পশ্চিম পাকিস্তানের মরুপ্রবণ বিশুদ্ধ প্রকৃতির বিপরীতে এক ভিন্ন বিপরীত প্রকৃতি—জীবন আর চৈতন্যের আওয়াজ তোলে। 'নদীর গল্প' কবিতায় কবি নদীকে দেখেন গতিমানতা এবং প্রবাহমানতার প্রতীক হিসেবে। কবির ভাষ্যে নদী তাই হয়ে ওঠে বহমান প্রাণময় সত্তার প্রতীক:

বড় বেশী প্রান্তরের নীচে তৃণও বাঁচে না
এই সত্য জানে যারা তাদের পাণ্ডুর দীপাবলি
যদি নিসর্গের গ্লাসকেসে রেখে দাও
ফুলের উজ্জ্বল জামদানী ঘিরে রাখ
তবুও বেদনা জানে সন্ধ্যায় অলীক বিভাস

বরং পাথর ভাঙো, জাগাও নদীর বুকে হাসি।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৯৭)

'নদী' কবিতায় কবি নদীকে জননী বলে অভিহিত করেন। নদী তাঁর চেতনায় হয়ে উঠেছে প্রাণের দ্যোতক। নাগরিক সভ্যতা, শহরের পথ, ট্রাফিকের তীক্ষ্ণ রোল, বিপুল বিমানের প্রপেলারে হাওয়ার শব্দ যখন কবির ঘুম কেড়ে নিয়েছে, তখন কবির আরাধ্য নিসর্গ, নদীর সংগীত, তটিনীর বিপুল বিথার। নদীর দুই তীরে ধানিজমি, সেখানে ধবল বক বিচরণ করে, আর ভিনদেশি মাল্লারা সাম্পানের গুণ টেনে গান গায়। কবি তাই বলেন:

ঘুমুতে পারি না আমি, হে জননী, তোমার গভীরে
আমাকে পাঠাও ডাক, আমি ত তোমার
সবল হালের মুঠি তুলে দাও আমার আঙুলে
সাগরের হাওয়া দাও ভরে দিক জরাজীর্ণ বুক।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ১৯৫)

কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে যখন জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে, তখন ওই জাতি তার নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য স্মরণে এবং পুনর্গঠনে মনোযোগী হয়। এই কাজটি সংগঠিত হয় মূলত সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে। আর এর ব্যাপক প্রকাশ ঘটে ওই জনগোষ্ঠীর কবি-সাহিত্যিকদের কাব্য-কবিতা এবং অপরাপর সাহিত্য ও শিল্পকর্মে। বাংলা সাহিত্যে এই প্রবণত বরাবরই ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের সময়ে এটি সচেতন রাজনৈতিক প্রয়াস হয়ে উঠেছিল। কবি-সাহিত্যিকগণ পাকিস্তানি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মধ্যে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করার অংশ হিসেবে কবিতায় পূর্ববাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যের পৌনঃপুনিক ব্যবহার করেছেন। সানাউল হকের *বিচূর্ণ আর্শিতে* (১৯৬৮) কাব্যের 'পূর্ব বাংলা-দুই' কবিতায় পূর্ববাংলার বিশেষত্ব বলতে গিয়ে এর কিছু লক্ষণ আবিষ্কার করেন: 'এ কথার আগেই চোখে পানি/ ছোবলে বেহুলা,/ ভেলায় ভাসিয়ে দিয়ে আশা/ তরঙ্গ মৃদুলা' (১৯৯৮: ১৪৫)। কবিতায় বেহুলার প্রসঙ্গ কবিতাটিকে অরাজনৈতিক রাখেনি। আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, 'মনসার আক্রোশী দু চোখে উপেক্ষার ধুলো ছুড়ে হয়েছি সর্বস্বান্ত' অথবা 'তুই চিরদিন আমার রাধিকা' (২০০১: ৬)। ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণ এই ত্রিমাত্রিক মিশ্রণ হুমায়ুন কবিরের কবিতার মৌল অনুষঙ্গ। তিনি তাঁর কবিতায় পুরাবিৎ মানসতা নিয়ে বাঙালি জাতির অতীত ঐতিহ্যকে অনুসন্ধান করেছেন। হুমায়ুন কবিরের 'বৃক্ষ', 'জলের ছায়া', 'করালী বেহুলা', 'রক্তবীজ', অর্ফিয়ূস ১৯৬৬', 'একদা উর্বরতা,' 'আমার সাধের বঙ্গে', 'ফাল্গুনের বিকাল', 'একদা কৈশোরে', 'কবর ভাঙ্গার গান', 'বাংলার কারবালা', 'কবিতাকে: অ্যালবাট্রস স্বপ্ন', 'আলোর পাখীকে', 'সূর্যের কামনা', 'চন্দ্রবিজয়ে কবিদের প্রতিক্রিয়া বিষয়ক', 'কালরাত' প্রভৃতি কবিতায় এসেছে পুরাণ-ইতিহাস-ঐতিহ্য। 'বৃক্ষ' কবিতায় সীমার আর তার খঞ্জরের প্রসঙ্গ রয়েছে, 'জলের ছায়া' কবিতায় চাঁদ সওদাগরের প্রসঙ্গ রয়েছে, আরো রয়েছে তার বাণিজ্যতরি সপ্তডিঙ্গার প্রসঙ্গ। 'করালী বেহুলা' কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে লোকপুরাণ। সংগ্রামী এবং বিদ্রোহী নারীরূপে বেহুলাকে অঙ্কন করেছেন কবি। এই কবিতায় 'বেহুলা' পূর্ববাংলার প্রতীক। এই বাংলা যেমন যুগে যুগে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বারা শোষিত-নির্যাতিত হয়েছে, তেমন আত্মত্যাগ, বিপ্লব আর সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায়ে কুণ্ঠাবোধ করেনি। 'করালী বেহুলা' কবিতায় কবির উচ্চারণ:

কলার মান্দাসে আজ বেহুলা ভাসে না বুঝি
শরীরী আগুন তার দেহ; করাল কাপালী নারী
আগুনের তরঙ্গে ফোঁপায়, বুঝি ঝড় উঠে আসে।
চম্পকনগরে থাকি বৃদ্ধ চাঁদ বণিক আমরা
বেহুলা বলায় শোন—খোঁজ সেই কুটিল নাগিনী
ছিন্ন ভিন্ন হত্যা কর, দগ্ধ কর, বিষময় দেহ।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৪৪)

'অর্ফিয়ূস ১৯৬৬' কবিতা গ্রিক পুরাণের মহাকাব্যের উপদেবী ক্যালিওপীর পুত্র অর্ফিয়ূসকে উপজীব্য করে লেখা। অ্যাপোলোর কাছ থেকে একটি বীণা পেয়ে অর্ফিয়ূস তাতে যে সুর তুলতেন, তাতে জন্তু, গাছপালা, ঝরনাধারা পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে সুর শ্রবণ করত। প্রেমিকা ইউরিদাইসকে হারিয়ে পাগলপ্রায় অর্ফিয়ূস ডায়ানোসিসাসের কুৎসা রটনা করলে পূজারিরা অর্ফিইয়ূসকে হত্যা করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। অর্ফিয়ূসের ছিন্ন মস্তক গান গাইতে গাইতে লেসবস দ্বীপে পৌঁছায়। অধিবাসীরা তার নামে সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। গ্রিক মিথোলজির এই সুরের সঙ্গে বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজের আনন্দকে সমীকৃত করেছেন কবি:

হায়েনার দিল খুলে ভেজাবে সে বাগানের আল
ঘৃণিত পশুর রক্তে সিক্ত হবে প্রান্তরের ধুলো
তবে আসবে মাঠে পবিত্র বীজের মৌসুম:
চাষীর জটলে মিশে গান গাই ফসল ... ফসল।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ১৩৪)

'একদা উর্বরতা' কবিতায় ডালিমকুমার, সুয়োরানি, রত্নমালা কন্যার প্রসঙ্গ এসেছে। 'আমার সাধের বঙ্গে' কবিতায় এসেছে হীরামন পাখির প্রসঙ্গ। এ ছাড়া তাঁর রাধা, রক্তবীজ, কাজলরেখা, হানিফা, অ্যাপোলো, জ্যাসন, ট্রোজান ঘোড়া প্রভৃতি পৌরাণিক-ঐতিহাসিক-ঐতিহ্যিক শব্দবন্ধ তার কবিতার অবয়ব নির্মাণ করেছে।

মানুষ পৃথিবীতে বাঁচার তাগিদ অনুভব করে অনুভূতির মাধ্যমে আর এই অনুভূতির নিবিড় পর্যবেক্ষণ থেকে জন্ম নেয় সাহিত্য। কবিতার জগতে অনুভূতির প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি বলেই হয়তো কবিতা মানব-মনকে সহজেই আবিষ্ট করতে সক্ষম। তবে কাব্যের গ্রহণযোগ্যতা তখনই পরিপূর্ণ বলে গণ্য হয় যখন শৈল্পিক সৌন্দর্য পাঠকের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিষয় বৈচিত্র্যের পাশাপাশি শিল্প-সৌন্দর্যেও অসাধারণ হয়ে আছে হুমায়ুন কবিরের কবিতা। তাঁর কবিতার শিল্পসুষমা বিশ্লেষণ করতে হলে অলংকার প্রয়োগ, শব্দ ব্যবহারের কৌশল, ভাষা প্রয়োগের দক্ষতা, কাব্যের নির্মাণশৈলী ইত্যাদি বিষয় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। মূলত বিষয়ের গতিপ্রকৃতি ঠিক করে দেয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিল্পমূর্তি কী দাঁড়াবে। বাংলা কবিতায় অলংকারের ব্যবহার একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ হলেও প্রত্যেক কবির দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপস্থাপন কৌশলের ভিন্নতার কারণে কবিতা নতুন রূপ ধারণ করে। কাব্যভাষা উন্নত, প্রবুদ্ধ ও বিকশিত চৈতন্যের ভাষা। ষাটের দশকের কবিতায় প্রথম অস্তিত্ববাদ, পরাবাস্তববাদ, অভিব্যক্তিবাদ ইত্যাদি শিল্প-আন্দোলন সচেতন কাব্যিক অনুষঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়। দেশবিভাগের পর বাংলাদেশের কবিতার রাজধানী হিসেবে আবির্ভূত হয় ঢাকা। কলকাতার আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভের দুরন্ত বাসনায় চল্লিশ-পঞ্চাশের কবিরা নতুন ভাষার সন্ধানে খননকার্য চালান

দেশ-কাল-মৃত্তিকার গভীরে। অবশেষে ষাটের দশকে এসে বাংলাদেশের কবিতার ভাষা স্বতন্ত্র ভিত্তিভূমি খুঁজে পায়। ষাটের দশকের কবিরা অনন্য মানসতা এবং স্বতন্ত্র জীবনভাষ্য উপস্থাপনে সতত সাধনায় নির্মাণ করেছেন একটি নিজস্ব প্রকরণশৈলী, প্রাতিস্বিক কবিভাষা এবং বিশিষ্ট অলংকার সৃজনরীতি।

হুমায়ুন কবিরের কবিতায় উপমা, চিত্রকল্প, প্রতীক, অনুপ্রাসের অসাধারণ প্রয়োগ রয়েছে। কাব্যে উপমার গুরুত্ব কবিমাত্রই উপলব্ধি করেন। জীবনানন্দ দাশ 'উপমাই কবিত্ব' বলে বিশ্বাস করেছেন। যুগের পরিক্রমায় কাব্যের উপমা প্রয়োগে যেমন অভিনবত্ব তৈরি হয়েছে, তেমনি পরিবর্তন ঘটেছে কবিতার গঠন প্রকৃতিরও। একসময় কবিতায় প্রকৃতিকে উপজীব্য করে উপমার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় একেবারে আটপৌরে উপাদানের সঙ্গে চরিত্রের অসাধারণ তুলনার নজির। যেমন: 'সেই বর যোগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা/ খুঁজিয়া পাইল যেন, হাঁড়ির মত সরা' (কালকেতু উপাখ্যান)। আবার মধ্যযুগের মহাকবি আলাওল প্রকৃতি থেকে চমৎকার সব উপমা এনে সাজিয়েছিলেন তাঁর *পদ্মাবতী* কাব্য। আধুনিক কবিতায় এই উপমা প্রয়োগে ব্যাপক ভিন্নতা দেখা যায়। জীবনাচারণের পরিবর্তন কবিদের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির যে বদল ঘটিয়েছে, তারই প্রতিফলন রয়েছে তাঁদের কবিতায়। হুমায়ুন কবির তাঁর কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে আশ্রয় করে উপমার ভাষা তৈরি করেছেন। কোথাও উপমার প্রয়োগ বিমূর্ত, আবার কোথাও তা মূর্ত হয়ে পাঠকের অনুভূতিকে নাড়িয়ে দেয়। তাঁর কবিতায় উপমার সৌন্দর্য ধরা দেয় তুলনাবাচক শব্দের যথাযথ প্রয়োগে। সেখানে কখনো মূর্ত কখনো বিমূর্ত উপমান-উপমেয়ের রূপ নিয়ে পাঠকের কাছে কবিতার আবেদন তুলে ধরে। আবার মূর্ত উপমান ও উপমেয়ের দৃষ্টান্তও আছে প্রচুর:

১. রাত্রি হলে জলের ঘরে জ্বলে না মাছ রূপোর মত দেহে ('নিঃসঙ্গ')

২. অপরাহ্ণ নেমে এলে শিউলির মতন আলোক ('অপরাহ্ণের কবিতা')

৩. উটের গ্রীবার মতো কিমাকার গোপন বিনাশ ('জীবনানন্দ দাশ')

৪. গোপন মোমের মতো জেগে থাকে তোমাকে স্পর্শের স্মৃতি ('প্রেম ছাড়া বড় ম্লান')

৫. কমলালেবুর মতো রিক্ত ঠোঁটে লেগে থাকা রোগাতুর হাসি। ('হাসপাতাল থেকে ফেরা')

৬. সোনার টাকার মতো চকচকে এক গোছা ব্যাঙ ('শুধু বৃষ্টি পড়ে')

৭. মেয়েদের মতো লাল বাদামের পাতা/ মাঠের রোয়াকে শুয়ে/ মোহিনী জঠর মেলে ডাকে সর্বনাশ। ('ডিসেম্বরে নিসর্গ')

৮. বেদনার মতো মেঘ জমে থাকে আকাশের চারপাশে ('শ্রাবণ আমাকে')

৯. বাদুরের মতো জেদী লাল স্কুটার/ বদরাগী বাতাসের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতায়/ ছুটছি। ('জেদী লাল স্কুটার')

১০. শিশির নামাল গ্রীবা সুবাসিত সর্পিণীর মতো। ('যেন চলে যাই')

১১. কাটা আঙ্গুলের মতো লোহিতাভ অসুস্থ আঙ্গুর। ('অসুখ')

১২. চশমার কাঁচে যার ইস্পাতের ঘর ও বাগান/ ছায়া ফ্যালে, হাসছে যে গীটারের মতো। ('ভার্সিটি ক্যাম্পাসে বৃষ্টি')

১৩. নীলকণ্ঠ পাখীর মতো নরম ঘুমেল রোদে পা ছড়িয়ে বসে বাসনার একান্ত প্রচ্ছদে। ('রোদের পাখীরা')

১৪. পাউরুটির মতো বাসি আমাদের দিন ('বিস্ফোরণের পথে')

১৫. কালরাত থেকে কতিপয় নক্ষত্র আমার/ শিরায় ছুটছে রকমারী অঙ্কের মতো। ('কালরাত')

তাঁর কবিতায় শুধু বিষয়ের প্রগাঢ়তা বোঝাতে নয়, উপমা ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যকে কাঙ্ক্ষিত ভাবের জগতে পৌঁছানোর জন্যও। কখনো তিনি নিজে উপমার সৌন্দর্য দেখিয়ে দিয়েছেন, আবার কখনো সৌন্দর্য অন্বেষণের ভার ছেড়ে দিয়েছেন পাঠকের হাতে।

প্রতীকের সাধারণ অভিধাগত অর্থ হচ্ছে চিহ্ন বা দ্যোতক। প্রতীকচেতনা মানুষের সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক ও নন্দনতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বায়তুল্লাহ্ কাদেরী বলেন:

> প্রতীকের উৎস যেমন মনোচিত্রের 'আইডিয়া' বা ভাবের সংবেদনাকে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিতে প্রকাশোক্ষম প্রক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত, তেমনি এর রহস্যঘনতা ও অনুভববেদ্যতাও শব্দ, বস্তু, রঙ, প্রকৃতি প্রভৃতির সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বাহক হয়ে সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রতিটি কবিই তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, পারিপার্শ্বিকতা ও মনোরাসায়নিক সাংগঠনিক ঐক্যের ভিত্তিতেই প্রতীক- উপাদান নির্বাচন করে থাকেন। (২০০৯: ১৮৩)

হুমায়ুন কবির সাপ ('রাতের গল্প', 'শব্দমন্ত্র', 'তবু সরীসৃপ নয়', 'করালী বেহুলা', 'ইস্পাত ও ফুলের ভালবাসা' কবিতায়), কুকুর ('কুকুর যেমন করে', 'মার্চে প্রথম কারফ্যু' কবিতায়), বিদ্যুৎ ('তোমাকে বেসেছি ভালো', 'যাদের রক্তাক্ত দেহ' কবিতায়), নর্তকী ('তবু সরীসৃপ নয়' কবিতায়), ইস্পাত ('ইস্পাত ও ফুলের ভালবাসা' কবিতায়), পুষ্প ('ঘুম', 'ডিসেম্বরে নিসর্গ', 'এপ্রিলে রচিত কবিতা ১৯৭১', 'স্বাধীনতা দর্পণে ব্যথিতা', 'ইস্পাত ও ফুলের ভালবাসা' কবিতায়), নিসর্গ ('ডিসেম্বরে নিসর্গ' কবিতায়), চাঁদ ('শারদ চিন্তা' কবিতায়), অন্ধকার ('নিঃসঙ্গ', 'ভয়', 'পাখীকে', 'পদাবলীর মতো', 'কোন কোন জ্যোৎস্নায় মৃতদের মুখ', 'তাঁর মৃত্যু', 'এস তুমি', 'বাতাসবাহিনী', 'প্রতিক্ষণেই' কবিতায়), পাখী ('বৃষ্টিতে একটি পাখী', 'শুধু বৃষ্টি পড়ে', 'বৃক্ষাভিযান', 'একটি পোকার স্নেহে', 'পাখীকে', 'রাজার দুলাল নই', 'এ কেমন শহর', 'বধ্যভূমির নিসর্গ' কবিতায়) ইত্যাদি প্রতীকের মাধ্যমে নিজের কবিসত্তার দহন ও অস্তিত্বসংকটকে তুলে ধরেছেন। দৃষ্টান্ত:

১. কফিন কালো অন্ধকারে নড়ে না কোন স্বর। ('নিঃসঙ্গ')

২. বাতাসে হাজার ভাসে পাখীদের সবুজ আভাস,/ শিরার সান্নিধ্যে সেই অপরাহ্ণ জ্বালা হয়ে গেল; ('অপরাহ্ণের কবিতা')

৩. তাদের পায়ের নীচে এই পাখী, মৃতপাখী/ অন্য কোন ফুল যেন আজ। ('বৃষ্টিতে একটি পাখী')

৪. সাপের সবুজ জিভ কৃষ্ণতাকে ফোঁড়ে ও/ পাতায় নিখিলের দোলা দেয়: তুমি ও সেখানে। ('ল্যাণ্ডস্কেপ')

৫. একটি দুর্লভ পাখী বহুক্ষণ থেকে/ অতন্দ্র পাহারা দিয়ে রাখছে আমার শ্রম। ('বৃক্ষাভিযান')

৬. কি অভ্রান্ত অনায়াসে বালক বেলার ঝোপ ঝাড়/ নিসর্গের নদী আর মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটি। ('একটি পোকার স্নেহে')

৭. কিসের আশায় তুমি বসে থাক; পাখী, ছোট পাখী/ মৃত্যুর ঘড়ির নীচে দীর্ঘ শীর্ষ বৃদ্ধ ম্যানশনে। ('পাখীকে')

৮. এক আঁধারে গোলাপ বনে কেউ ছিল না/ কেবল সাপ স্মৃতির সাথে ফুলের সাথে/ রতি পরিমলের মতো লুকিয়ে ছিল। ('রাতের গল্প')

৯. ফিরে আমি ফের ভীরু/ পদাঘাতে পিষ্ট তবু কুকুর যেমন করে/ ফিরে আসে তার প্রভু ঘাতকের কাছে। ('কুকুর যেমন করে')

১০. চাঁদ জেগে ওঠে, তমালের বনে এলোমেলো ঝড়/ বড় ভয় জাগে একা এই কালো অন্ধকারে। ('পদাবলীর মতো')

১১. নিসর্গ জ্বলছে যেন হরিৎ বাঘিনী। ('ডিসেম্বরে নিসর্গ')

১২. অনুকারে চরাচরে একটি সুশান্ত পাখী তার/ নিসর্গের হরতাল ডেকে গেল, ছড়াল বেদনা। ('রাজার দুলাল নই')

১৩. নীরবে উগরে দিল খাকী দেহ। লাল চোখ/ ইস্পাতের হিংস্র দাঁত মিলিটারী কয়েক হাজার। ('মার্চে প্রথম কারফ্যু')

১৪. কেমন একটি পাখী ম্লান ঠোঁটে খুটছে পালক,/ সূর্য সরে গেলে ছায়া তবু স্থির থাকে। ('বধ্যভূমির নিসর্গ')

১৫. নিসর্গ ঈশ্বর জেনে, মায়াবী আবাসে/ পাখীদের মতো আমি ছিলাম সরল। ('ব্যগ্র তূণীর')

১৬. ইস্পাতের সাথে মিশে/ রক্তের ঘ্রাণ তাকে বুঝিয়েছে জন্মভূমি। ('আমার ভাই')

১৭. ইস্পাতের পাশে ফুল/ ফুলের সাথে কংক্রীটের ভালবাসা/ ফুলের গর্তে সাপ, পাপ ('ইস্পাত ও ফুলের ভালবাসা')

১৮. চোখের ভিতরে ছুটে চলে যায় দ্রুত বিদ্যুৎ/ চুলের ভিতরে আঁকাবাঁকা খেলে সাপের মতো। ('জলপ্রপাত')

১৯. অন্ধকার ছেড়ে দিল, চলে আসি আর এক টানেলে/ মানুষের বাধা নেই, নেই কোনো ইস্পাতের ধার ('যেন চলে যাই')

২০. শরীরে নুনের গন্ধ মেখে নেব আমিও—স্রোতের ইঙ্গিতে/ নৌকা ভাসাব কোন অন্ধকারে, তরণী ভাসাব। ('নদী')

ষাটের দশকের কবিতায় প্রাকরণিক অনুষঙ্গ হিসেবে সমাসোক্তি ও অন্যাসক্ত অলংকারের ব্যবহার পাওয়া যায়। চেতন প্রাণীর ক্রিয়া যখন অচেতন, জড় বা বিমূর্ত বিষয়ের ওপর আরোপ করা হয়, তখন তা হয় সমাসোক্তি অলংকার। এ অলংকারে উপমেয়ের উল্লেখ থাকে, উপমানের উল্লেখ থাকে না। আবার জড়বস্তুর ওপর যদি বিশেষণ বা গুণের আরোপ করা হয়, তখন সেটি হয় অন্যাসক্ত অলংকার। কবির তীব্র জীবনাকাঙ্ক্ষা, রুগ্‌ণ অস্থির বৈপরীত্যময় মানসিকতা, কবিসত্তার অবদমনে অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছার প্রতিফলনে প্রতীকী এবং সাংকেতিক বক্তব্যের চিত্রকল্প নির্মাণের অনুষঙ্গরূপে সমাসোক্তি এবং অন্যাসক্ত অলংকারের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। দৃষ্টান্ত:

১. বাগানে যাই বাগানে নেই পাপ/ ঘাসের চোখে শিশুর অভিলাষ। ('বাগান')

২. ভরন্ত বাতাস এসে বাদলের শীতার্ত শিহরে/ আঙ্গুল বুলিয়ে যায় পাখীর সবুজ ঠোঁটে সবুজ চিবুকে। ('বৃষ্টিতে একটি পাখী')

৩. গোলাপ নিহত আজ ঘুম আসে ফেরারী-আলোকে ('ঘুম')

৪. শেফালী জ্যোৎস্নার রাতে কৈশোরের স্বপ্নের মতন/ রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণারা বুক চেপে রাখে সারাক্ষণ ('তোমাকে বেসেছি ভালো')

৫. বেদনার মতো মেঘ জমে থাকে আকাশের/ চারপাশে; শ্রাবণ আমাকে একা করে গেল। ('শ্রাবণ আমাকে')

৬. বাতাস করেছে পান ফাল্গুনের প্রথম পূর্ণিমা ('শ্রাবণ আমাকে')

৭. ডাস্টবিন ঘুমায়/ নিভৃতে তার খোঁড়া কুকুরকে কোলে নিয়ে। ('মার্চের প্রথম কারফ্যু')

৮. বসে থাকা বাহারী গাছটি খুব হেসে ফেলল হঠাৎ ('রোববার')

৯. একটি বাতাস এসে পরামর্শ দিয়েছে হাঁটতে। ('রোববার')

১০. শিশির নামাল গ্রীবা সুবাসিত সর্পিণীর মতো। ('যেন চলে যাই')

১১. উজ্জ্বল আকাশ নীল যাদুর গেলাশে বসে আছে। ('বাসনা')

১২. জেনেছে কাদের বুকে নক্ষত্রেরা হাঁটে সারারাত। ('মানুষের বুকের ওপর দিয়ে নক্ষত্রেরা')

হুমায়ুন কবিরের কবিতায় প্রচুর উৎপ্রেক্ষা অলংকার রয়েছে। যেমন:

১. তৃণের মতো তোমার উপকূলে/ কাঁপন যেন হারিয়ে যাওয়া ছেলে। ('জলের ছায়া')

২. সবুজ বিন্যাস খাবে শীত ক্রমে/ অভিরাম পত্রাবলী যেন দৃঢ় কুতুব মিনার। ('শারদ চিন্তা')

৩. নিসর্গ জ্বলছে যেন হরিৎ বাঘিনী ('ডিসম্বরে নিসর্গ')

৪. দ্যাখো নেমে এল বিষম শব্দে বৃষ্টি ধারা/ বৃক্ষরা যেন আরাধনা দীপ সবুজ শিখা। ('জলপ্রপাত')

হুমায়ুন কবির বিশেষণ ব্যবহারেও স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। তাঁর বিশেষণ কখনো অপ্রকাশিত ভাবপুঞ্জের সহায়ক অনুষঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আত্মঅস্তিত্বের অনুভব প্রকাশে, সংবেদনশীলতায়, সময়-সমাজ-স্বদেশ অন্বেষায় তাঁর বিশেষণ ব্যবহারের প্রয়াস লক্ষণীয়। তাঁর কবিতায় বিশেষণের নতুন নতুন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। কবিতার আঙ্গিক বিবেচনায় উপমা, রূপক, চিত্রকল্পে বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে ভাষিক, সংহত ও আবেগধর্মী আবেদন সৃষ্টিতে। যেমন—নরম, কোমল, দুরন্ত, কৃপণ, কালো, ভাঁজভাঙ্গা, দ্রুত, স্নিগ্ধশ্যাম, শীতার্ত, বিপুল, মৃদু, মাতাল, সবল, বিশীর্ণ, সুনীল, তিক্ত, আকাঙ্ক্ষিত, রূপালী, দীপ্র, বিমর্ষ, মদির, আনত, শান্তি, ভাঙ্গাচোরা, প্রসন্ন, মলিন, রোগাতুর, ক্লিষ্ট, নিবিড়, মসৃণ, ফলন্ত, দুরন্ত, নিভৃত, মায়াবী, শ্বেত ধূসর, গোপন, বিশাল, ঘনশ্যাম, চিকন, দুর্লভ, বঙ্কিম, অচিন, দর্পিত, রুদ্র, সফল, শিউলীউর্বর, সুধীর, বিধ্বস্ত, সুকঠিন, ছিন্ন, পরম, নিষ্ঠুর, গৈরিক, হরিৎ, বর্ণময়, ধীরোদাত্ত, রক্তিম, সংকীর্ণ, শোকতাপলীন, কুসুমিত, ফসলী, খয়েরী, পোশাকী, কুটিল, বিষময়,

সর্বনাশা, দ্যুতিময়, খাকী, পুষ্পিত, তীব্রনাদী, ভৌতিক, কলঙ্কিত, প্যাস্টোরাল, করাল, দীঘল, নিদ্রালু, প্রভৃতি বিশেষণ কবি ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতাকে বোধের অনুকূল করতে।

হুমায়ুন কবিরের কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে প্রচুর পরিমাণ ইংরেজি শব্দ। যেমন: পার্ক, ডোয়ার্ফ, টেবিল, ট্রাফিক কার্নিভাল, কফিন, করিডর, সেমিনার, হেডস্যার, মার্বেল, স্ট্রীট, এ্যাভিন্যু, এ্যাস্ফল্ট, কার্পেট, কংক্রীট, ল্যাম্পপোস্ট, ফ্রীজ, টেনিস, ইশকুল, গীটার, সীসমোগ্রাফ, ট্রেন, ব্রিজ, ম্যানশন, রেসকোর্স, স্টেডিয়াম, ভায়োলীন, ডাইনামো, পোর্টিকো, রেস্পিরেশন, ফটোগ্রাফ, ব্যারোমিটার, মেশিনগান, কলিশন, প্যাস্টোরাল, ইস্পাত, রেল, স্লিপার, সুপার মার্কেট, ডাস্টবিন, প্রিজনভ্যান, মিলিটারী, ট্যাঙ্ক, স্টিল, মাউথ অর্গান, মেজর, ওয়েদার, ম্যানিপ্ল্যান্ট, মিউনিসিপ্যালিটি, ব্লাইন্ড লেন, কোরাস, স্কালপচার, ক্যান্টিন, সিগারেট, কর্পাসেল, লেড পয়জনিং, কার্নিভাল, ফ্লোরোসেন্ট, ক্লোরোফিল, ইউক্যালিপটাস, সিম্ফনি ইত্যাদি।

রঙের ব্যবহার কবিচিত্তের কল্পনাশ্রিত সৃষ্টিশীল অনুভূতির সম্প্রকাশক। রঙের মাধ্যমে একজন সৃষ্টিশীল কবি তাঁর সত্তায় প্রতিফলিত জগতকে উন্মোচন করেন। ষাটের কবিরা প্রচলিত রঙকে ভেঙেচুরে বিচিত্র রঙের প্রতিসাম্য তৈরি করেন। তাঁদের কবিতায় রঙের বিচিত্র প্রকাশ কবিদের মনোজগতের বৈশিষ্ট্যের স্মারক হয়ে উঠেছে। হুমায়ুন কবিরের কবিতায় রঙের বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ করা যায়:

১. বাগানে যাই বাগানে বড় সুখ/ সেখানে পাতা বুকের মতন বড়/ সেখানে হাওয়া হিমের ছোঁয়া নেই/ সবুজ লাল গোলাপ চতুর্মুখ। ('বাগান')

২. কফিন কালো অন্ধকারে নড়ে না কোনো স্বর ('নিঃসঙ্গ')

৩. বাতাসে হাজার ভাসে পাখীদের সবুজ আভাস। ('অপরাহ্নের কবিতা')

৪. পাখীটির শুদ্ধ চোখে বৃষ্টির স্ফটিক ভাঙ্গে, বালকের মার্বেল/ যেমন হলুদ সবুজ নীল বিবিধ কাচের। ('বৃষ্টিতে একটি পাখী')

৫. একটি গোপন সুর মল্লারের মতন নিয়মে/ ছলছল নীল মাঠে শ্যামাঘাসে শালিখের রোমে। ('শুধু বৃষ্টি পড়ে')

৬. উড়ছে মাথার চুল নড়ছে আঙ্গুল/ যেন ঝরে যায় ঘুম তার শাদা জ্যোৎস্নায়। ('আমার ভাই')

৭. সবুজ বিন্যাস খাবে শীত ক্রমে/ অভিরাম পত্রাবলী যেন দৃঢ় কুতুব মিনার। ('শারদ চিন্তা')

৮. লাল হীরে জ্বলা বুকে দেখি ছুঁয়ে আছো/ রক্তহীন রোদ, লাল বাড়ী ('পাখীকে')

৯. সমুদ্রের দিকে তারা ভেসে যেতে সুনীল জলধি/ সেই লাল বল আর ফিরিয়ে দেব না তার হাতে। ('শোক')

১০. বাংলার শস্যক্ষেত্রে বহুবার বর্গীর ঝাঁক/ এবং চিতার পালে রুধিরাক্ত খয়েরী হরিণ। ('জানুয়ারী ১৯৬৯')

১১. তারার নীচে মানুষের লাল বাড়িঘর। ('খড়ের শব্দ')

১২. গর্জাচ্ছে লাল জেদী লাল পশু। ('জেদী লাল স্কুটার')

গদ্যসাহিত্য থেকে কবিতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পৃথক হয়ে যায় তার গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের কারণে। পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস, ছন্দ, বয়ানভঙ্গি, বাক্য ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে যে দোলায়মানতা সৃষ্টি হয়, তা-ই কবিতাকে বিশেষ করে তোলে। পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের ক্ষেত্রে হুমায়ুন কবিরের কবিতায় বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে। তাঁর কবিতায় অন্ত্যমিলযুক্ত এবং অন্ত্যমিলহীন উভয় প্রকার পঙ্‌ক্তি লক্ষণীয়। যেমন:

১. ঝড়ের মুখে খড়ের মতো ভাঙছে তোমার বিভা
প্রলয় জলে ভাসছে আলোর ফুল
মৌমাছিকুল পথ পায়নি রক্তে ফোটায় হুল
নিটোল ঘরে থাকতে গিয়ে হঠাৎ উটের গ্রীবা। ('খুন')

২. সুঠাম বৃক্ষের সারি আমাদের ধারণ করেছে
স্ট্রীটহীন এই বন; মাতাল খুরের কোলাহল
বেশরম লাল শীত নিভে গেছে; পালিয়েছে বিনষ্ট গণিকা
এই বন ধীরস্থির, নম্রনত অপুর সংসার। ('বৃক্ষ')

একই শব্দের ও বাক্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে পঙ্‌ক্তি সাজিয়ে তোলেন তিনি। যেমন 'ভয়' কবিতায়:

ভূতের ভয়ে রাতবিরাতে পথ চলি না পথ চলি না
পথ চলি না আঁধার রাতে দীঘির পাড়ে দুপুর রোদে
শূন্যমাঠে পা দিই না পথ চলি না শিশির ভেজা পথে।

'পার্শ্ববর্তিনী সহপাঠিনীকে' কবিতায় কবি প্রয়োগ করেছেন নাটকীয় স্বগতোক্তি:

স্নান কি করনি আজ? চুল তাই মৃদু এলোমেলো
খেয়েছ তো? ক্লাশ ছিল সকাল ন'টায়?
কিছুই লাগে না ভালো, পাজামা প্রচুর ধুলো ভরা
জামাটায় ভাঁজ নেই পাঁচদিন আজ

এভাবেই *কুসুমিত ইস্পাতে*র কবি হুমায়ুন কবিরের কবিতায় সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে কাব্যগঠন কৌশল। তাঁর শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা, বাক্যের নির্মাণকৌশল, ভাষার ব্যবহার তাঁর কবিতাকে ঋদ্ধ করেছে। হুমায়ুন কবির সম্পর্কে ষাটের দশকের আরেক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন:

আরেক লোরকা তিনি, বঙ্গদেশীয় লোরকা, রক্তাক্ত হয়েছেন জীবনে, মৃত্যুতে, কবিতায়। তাঁর শিরায় স্রোত প্রবহমান, কবিতায় তাকে অবলীলায় ধারণ করেছেন। (১৯৮৫: ১১)

হুমায়ুন কবিরের লেখায় রাজনৈতিক প্রসঙ্গ থাকলেও প্রকৃতি ও নিসর্গমুখী রোমান্টিকতাই তাঁর কবিতার প্রাণ। লেখায় মধ্যবিত্ত শ্রেণিবৈশিষ্ট্য খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়:

বজ্রপাতে ভয় হোত। এপ্রিলের পর
লুকনো বন্দুক থেকে ক্ষিপ্র স্বয়ংক্রিয়তায়
প্রয়োজনহীন ক'টি প্রাণী হত্যা করে জন্মেনি বিষাদ।
(হুমায়ুন ১৯৮৫: ৫৫)

হুমায়ুন কবিরের কবিতা নির্মাণ এবং বিকাশরূপ সম্পর্কে শহীদ ইকবালের ভাষ্য:

> গীতল, ছন্দোবদ্ধ, প্রতীক প্রতীমা, উপমানচিত্র আশ্রিত হুমায়ুন কবির। বোঝা যায়, তাঁর ভেতরে ত্রিশোত্তর চেতনা কাজ করলেও তা কীভাবে সেখান থেকে সরে এসে বাংলাদেশের স্বকালে শরণ নিয়েছে। (২০১৩: ১৫২)

ষাটের দশকের কবি হুমায়ুন কবির তাঁর কবিতায় সমকালীন জীবনের নেতি ও উজ্জীবনকে ধারণ করেছেন। কবি যেমন তাঁর কবিতায় অবক্ষয়, যন্ত্রণা, বিবমিষা, শাহরিক ক্লেদ ও গ্লানি, অস্তিত্ববোধ, বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্বকে দার্শনিক বোধ এবং প্রজ্ঞায় ধারণ করেছেন, তেমনি স্বকাল, সময়ের অভিঘাত, মুক্তিযুদ্ধ, দেশ-মৃত্তিকার গণসম্পৃক্ততা তাঁকে করেছে বিবর্তন ও রূপান্তরধর্মী। শিল্পসৃজনের তৃষ্ণাবেগে জারিত কবি মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে ছিলেন সঙ্ঘবিচ্ছিন্ন, বোহেমীয়, অবক্ষয়ে নিমজ্জিত ও আত্মকেন্দ্রিক; আবার মুক্তযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তিনি নতুন উদ্দীপনায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে একাত্ম হয়েছেন, সংগ্রাম ও সুন্দরের মতো দুই বিপরীত অনুষঙ্গকে মেলাতে চেয়েছেন। এজন্য তাঁর কাব্যের নামকরণ হয়েছে *কুসুমিত ইস্পাত*। জীবনচেতনার গভীরতায়, প্রাতিস্বিকবোধজাত অনুভবে, নিজস্ব শিল্পরীতিতে তিনি নির্মাণ করেছেন স্বতন্ত্র জগৎ। কবি হুমায়ুন কবির জরা-মৃত্যু-মারী-ভরা নীরব নিখিলে বাঁচতে চেয়েছেন একজন নিসর্গলীন জীবনানন্দের মতো। বাগ্‌ভঙ্গির অভিনবত্ব তাঁর কবিতাকে করেছে সমৃদ্ধ। ষাটের এই অকালপ্রয়াত কবির কবিতা, এককথায়, আধুনিকতার অনবদ্য নির্মিতি।

সহায়কপঞ্জি

আবদুর রাজ্জাক (১৯৮৭)। *বাঙলাদেশ: জাতির অবস্থা, জাতীয়তাবাদ-বিতর্ক* (মুহম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত)। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

আবদুল হক (১৯৯৬)। *লেখকের রোজনামচায় চারদশকের রাজনীতি-পরিক্রমা, প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশ (১৯৫৩-৯৩)*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

আবু হেনা মোস্তফা কামাল (২০০১)। *আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী* প্রথম খণ্ড (আনিসুজ্জামান ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

কুদরত-ই-হুদা (২০২২)। *জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ: বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী (২০০৯)। *বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ*। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী (২০১৮)। *কবিতার শব্দ-সাঁকো*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স

মাসুদুল হক (২০০৮)। *বাংলাদেশের কবিতার নন্দনতত্ত্ব*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

রফিকউল্লাহ খান (২০০২)। *বাংলাদেশের কবিতা: সমবায়ী স্বতন্ত্র স্বর*। ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড

শহীদ ইকবাল (২০১৩)। *বাংলাদেশে কবিতার ইতিহাস: ১৯৪৭-২০০০*। ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী

শামসুর রাহমান (২০১২)। *কবিতাসমগ্র-১*। ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী

সানাউল হক (১৯৯৮)। *সানাউল হক রচনাবলী* প্রথম খণ্ড (বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

সিকান্দার আবু জাফর (২০১৭)। *কবিতাসমগ্র* (আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত)। ঢাকা: বিভাস প্রকাশনী

সৈয়দ শামসুল হক (২০১২)। *কবিতাসমগ্র*। ঢাকা: চারুলিপি প্রকাশন

হুমায়ুন কবির (১৯৮৫)। *হুমায়ুন কবির রচনাবলী* (মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি